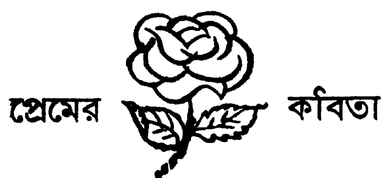
পঁচিশ বছরের



পঁচিশ বছরের

প্রেমের কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত



সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৫৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
পীযূষ মিত্র
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এন্ড কোম্পানি
৭।২ গ্রান্ট লেন
ব্লক রূপমুদ্রা লিমিটেড
৪ নিউ বহুবাজার লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম সাড়ে চার টাকা

পূর্বলেখ



সাহিত্য আমার মূল সাধনার বিষয় নয়, শৌখিন, কাজেই অনধিকার চর্চার বস্তু। কাব্যসংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনায় আমার অযোগ্যতা শুধু অন্যের কাছে নয়, আমার নিজের কাছেও খুব প্রকট। উপরন্তু আরেকটি বড় রকমের ত্রুটিও এ-ক্ষেত্রে স্বীকার্য। ইদানীং বহু সংখ্যক প্রবীণ ও তরুণ কবি, প্রশংসনীয়, অন্তত পঠনীয়, কবিতা প্রায় এক শত মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিকে প্রকাশ করছেন, প্রতি বৎসর কবিতার যত পুস্তক-পুস্তিকা ছাপা হচ্ছে তার সংখ্যাও কম নয়। এ-সমস্তের সঙ্গে যথা-যোগ্য পরিচয় রাখার জন্যে যে সময় ও সাধনার প্রয়োজন আমার পক্ষে তার অভাব ঘটেছে নানা কারণে। তার দরুনও কোনো-কোনো যোগ্য কবির বরণীয় রচনা এ-সংকলনে অনুপস্থিত।

দু-এক শতাব্দীর কালপ্রবাহে ধৌত হলে কাব্যবিচার থিতিয়ে দানা বাঁধে, সার্বজনীন না হোক, সুধীজনীন ঐকমত্য লাভ করে। কিন্তু একে-বারে সাম্প্রতিক রচনার পরখে অতিনৈকট্যের ফলেই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক, দিশাহারা খামখেয়াল বা ব্যক্তিগত পক্ষপাত জনিত তৌলচ্যুতি দুর্নিবার। সুতরাং সর্বসম্মতির আশা সে রাখতে পারে না—দাবি তো নয়ই। ধরেই নিচ্ছি যে এ-সংকলন ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয় কারণে অনেক পাঠকের বিরাগভাজন হবে, অনেক সমালোচকের বক্রোক্তির লক্ষ্য। তবুও স্বল্পবুদ্ধি দুঃসাহস নিয়ে কোনো-কোনো সম্পাদককে (বর্তমান সম্পাদকের মতো) এগিয়ে আসতেই হয়, সমসাময়িক কবিপ্রতিভা আবিষ্কার ও সমাদরের নান্য পন্থা বিদ্যতে।

নরেশ গুহ তাঁর রুচি ও পরিশ্রম দিয়ে এই সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনার গুরুভার অনেকখানি লাঘব করে দিয়েছেন, নইলে এ-দায়িত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবই হত না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকেও মূল্যবান সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিতার যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব এ-সংকলনে সম্ভব হয়নি। তাঁদের সঙ্গে আমাদের ভৌগোলিক ও আত্মিক নৈকট্য অনস্বীকার্য, কিন্তু রাজনৈতিক দূরত্ব দুস্তর। সেখান থেকে প্রকাশিত বই ও পত্রিকা এখানে দুষ্প্রাপ্য। ঢাকায় যে-সব সাহিত্যিক তরঙ্গ ওঠে, স্থায়িত্ব লাভ করে বা অচিরে বিলীন হয়ে যায়, তাদের ধ্বনিহিল্লোল কলকাতায় বসে ঠিকমতো অনুভব করা যায় না।

— সম্পাদক

সূচীপত্র





কবিতা ও প্রেম



প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে শিল্পী নকল করলেও তাতে কিছু বদল ঘটান, প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিকৃতি অসাধ্য বলে নয়, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য চোখের সামনে রেখেই তাঁরা তাঁদের রূপায়িত প্রতি-বিম্বকে বিম্বের অবিকল অনুবর্তী করতে অনিচ্ছুক। অনুকৃত মানবিক বা প্রাকৃতিক বিষয় যথেষ্ট সুন্দর নয়, সেই জন্য কি তার রূপায়নে যোজন-বর্জন উনোক্তি-অত্যুক্তি করেন শিল্পী—যাতে তাঁর সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে মনোহারিতায় ? কিন্তু উদ্দেশ্য যদি তাই হয় তবে কোনো কিছুব অনুকরণ বা অনুরূপায়ণ নিতান্তই অনাবশ্যক ; এমন সব রঙ রেখা ও ধ্বনির সন্নিপাত তো শিল্পী ঘটাতেই পারেন যা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, বাহ্য কোনো বিষয় নির্দেশ না করে, গভীর কোনো অর্থ উদ্‌ঘাটন না করে, আপন উপরিতলের লালিত্যেই রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করবে। ডেকরেটিব্ আর্ট অবশ্য আর্টের পর্যায়ই পড়ে—যদিও নিম্নতম পর্যায়। কিন্তু আর্ট মাত্রকে ডেকরেটিব্ আর্টের সঙ্গে এক করে যাঁরা বলেন কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ, তাঁদের অভাব ঘটেনি কোনো যুগে। অতুল গুপ্তের ভাষায় কাব্যবিচারে এঁরা দেহাত্মবাদী। মালার্মের বহু-উদ্ধৃত বাক্যটিতেও—

poetry is written with words, not ideas—

এই নান্দনিক দেহাত্মবাদেব প্রতি পক্ষপাত আছে বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু মালার্মে আসলে ছিলেন সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের সমীকরণে

বিশ্বাসী। এবং সঙ্গীতে কোনো অর্থযুক্ত শব্দের ব্যবহার না থাকলেও তার ধ্বনিপারম্পর্য কেবল শ্রুতিমধুর নয়, অর্থব্যঞ্জনাঘন। এলিয়ট এক সময়ে বলেছিলেন যে, কাব্যসমালোচনার গোড়ার কথা হল

Poetry is excellent words in excellent arrangement and excellent metre,

যেন এই ললিত পদবিন্যাসেব কোনো অর্থ না থাকলেই ভালো হত! হালের অনেক কবি যে অর্থপ্রকাশের চেয়ে অর্থগোপনেই অধিকতর পটু তা কে অস্বীকার করবে? এলিয়ট অবশ্য বলেছেন যে, কবিতার অর্থ একেবারে অবলুপ্ত না করে বরং অল্পাধিক রেখে দেওয়াই বিধেয়, সেটা পাঠকের সামনে ফেলে দিয়ে তার মনকে ব্যাপৃত রেখে কবিতা আপন কাজে এগিয়ে যেতে পারে—অনেকটা যেমন সিঁধকাটা চোর গৃহপালিত কুকুরের সামনে এক টুকরো মাংস ফেলে তার অভিসন্ধি পূর্ণ করে। কিন্তু পাঠকের মননশীলতাকে ভুলিয়ে কবিরা যে সহৃদয়ের হৃদয়কক্ষে সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েন, সেটাকেও এক প্রকারের অর্থদ্যোতনা বললে 'অর্থ' শব্দের অভিধার উপর কি খুব বেশি জুলুম করা হয়? অর্থাৎ কবিতার কোনো সুনির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ থাক বা না থাক, অন্য এক গূঢ়তর অর্থ বহন করবার শক্তি তার আছে যার জোরে সে বিশ্লেষণী মনের পাহারা এড়িয়ে হৃদয়ান্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পায়। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা কাব্যের দুই প্রকার অর্থের কথা বলেছেন—এক তার বাচ্যার্থ, এলিয়টের mince-meat; অন্যটা তার ব্যঙ্গার্থ, তাঁদের পরিভাষায় যার নাম ধ্বনি। রসবাদীদের মতে এই অর্থ দ্বৈধের মধ্যে প্রভেদ মৌলিক—এত মৌলিক যে প্রথমটিকে লৌকিক ও দ্বিতীয়টিকে অলৌকিক আখ্যা দিতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেননি। কবিতার এই অলৌকিক ব্যঙ্গার্থ কী?

পশ্চিমী নন্দনশাস্ত্রকারদের মধ্যে রুসোই বোধ করি প্রথম যিনি

কাব্যের রহস্য খুঁজলেন বহির্জগতে নয়, অন্তরের অন্তস্তলে, অসঙ্কোচে ঘোষণা করলেন কবিতা প্রধানতঃ কবির হৃদয়াবেগেরই বাহন। কিন্তু বিলাপও তো শোকার্তের অনুভূতি ব্যক্ত করে এবং শ্রোতার চিত্তে করুণা জাগায়; অথচ শোকের কান্নাকে শোকের কাব্য বলে অতি বড় মূর্খও ভুল করবে না। শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা তল্‌স্তয়ের শরণ নিয়ে বলতে পারি যে, শিল্পরচনা হচ্ছে অনুভূতির সংক্রামণ, অর্থাৎ সেই প্রকাশ যা শ্রোতার চিত্তে অনুরূপ ভাব জাগায়, ভিন্ন জাতীয় কোনো আবেগের উদ্রেক করে না। শোকের কাব্যকে যদি বলি দুঃখের প্রকাশ, শোকার্তের বিলাপ হবে দুঃখের প্রদর্শন। আরও এবং গুরুতর পার্থক্য এই যে, শিল্পী যা প্রকাশ করেন তা কোনো দিনানুদৈনিক অনুভূতি নয়, কারণ—উদাহরণতঃ—শোকের বিক্ষোভ, বিলোড়ন, প্রাবল্য, চাঞ্চল্য, ক্রিয়াকারিত্ব, তার মধ্যে কিছুই নেই; যত বিপুল, যত গভীর শোকই হোক, কাব্যে তার রূপটি বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ-মধুর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন—

Poetry is emotion recollected in tranquillity.

ট্র্যাঙ্কুইল্ তো বটেই, কিন্তু মনে-পড়ে-যাওয়ার সুদূরতা, বিগততা কিংবা আবছায়া ভাব তো কাব্যাধেয় নয়, কাব্যে যা প্রকট তা একান্তই উপস্থিত, স্ব-ক্ষেত্রে স্ব-ভাবে খুবই উজ্জ্বল। অথচ হৃদয়াবেগের পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না, প্রাত্যহিক জীবনের চেতনাপ্রবাহে তার দোসর খুঁজে মেলা ভার। আলঙ্কারিকেরা মনে করতেন যে, আমাদের হৃদয়ে যে-মূল ভাবগুলি রয়েছে কবিকর্মে তার বিশেষ এক রূপান্তর সাধিত হয়ে তারা পরিণত হয় রসে। আটপৌরে জীবনের ভাবগুলি যখন কোনো ব্যক্তির হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে তখন অত্যন্ত নির্ভুল ভাবে সেগুলি তারই। কাব্যের রস তাদের তুলনায় অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ও সাধারণীকৃত: "আমার বলে মনে হয় অথচ ঠিক যেন আমার নয়,

পরের কিন্তু সম্পূর্ণ পরের-ও তাকে বলা যায় না।" ('সাহিত্যদর্পণ')
ব্যবহারিক জীবনের অনুভূতি যখন কাব্যবর্ণিত রসে পরিণত হয় তখন আমরা সেই অনুভূতিগুলির দ্বারা অভিভূত না হয়ে যেন কোনো এক উর্ধ্বস্তর থেকে তাদের ধ্যানস্নিগ্ধ রূপ অবলোকন করি প্রশান্ত সমাহিতির মধ্যে—উপনিষদকথিত সেই পরমসাক্ষীর ন্যায়ই যিনি শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনঃ।

If in real life we had to endure all those emotions through which we live in Sophocles' Oedipus or in Shakespeare's King Lear we should scarcely survive the shock and strain. But art turns all these pains and outrages, these cruelties and atrocities, into a means of self-liberation, thus giving us an inner freedom which can not be attained in any other way.—*Cassirer. 'An Essay on Man,' p. 149*

তাই তো আলঙ্কারিকেরা রসলোককে বলেছেন অলৌকিক, রসাস্বাদকে মনে করতেন পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ। ধ্বনিবাদের মূল বক্তব্যকে একটি মাত্র সমাসবদ্ধ পদে সন্নিবদ্ধ করে গেছেন অভিনব গুপ্ত, বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়—রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদনরূপ একটি ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথও এই কথারই প্রতিধ্বনি করে এক জায়গায় বলেছেন, "রসমাত্রেই, অর্থাৎ সকল রকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষ ভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ।" ('সাহিত্যের পথে' পৃঃ ৫০)

কিন্তু আমাদের সম্বিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাশ্রয়ী ব্যাপার নয়। মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর ভাষায় তাকে জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা অবশ্য সোহংবাদেরই উল্টোপিঠ, এবং ভ্রান্তিবিলাসে দুই-ই তুল্যমূল্য। তবু একথা তো মানতেই হবে যে আমাদের চিন্ময় সত্তার প্রত্যেকটি ব্যাপার—তা সে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই হোক, আর এষণা-বাসনা বা

সুখদুঃখবোধই হোক—সমস্তই আপনাকে ছাড়িয়ে বাইরের কোনো বিষয়, জড়বস্তু কিংবা নির্বস্তুক তত্ত্ব, প্রিয়ার মুখ কিংবা পরমেশ্বরের চরণের দিকে নির্দেশ বহন করে থাকে। সম্বিৎ বিষয়ীধর্মী, তার মানে কোনো না কোনো বিষয়-সাপেক্ষ তার সত্তা। উদাহরণতঃ, দুঃখ বলে কোনো স্ব-তন্ত্র .মনোব্যাপার নেই, সন্তানের মৃত্যুসংবাদের শ্রুতি-প্রত্যক্ষচেতনার একটি বিশেষ বর্ণপ্রলেপকেই দুঃখ বলা হয়; তেমনি সুখ হচ্ছে প্রিয়তমার প্রসন্নবদনোপলব্ধির একটি দীপ্তিচ্ছটা। সুতরাং কাব্যকে হৃদয়াবেগেব প্রকাশ বলে ক্ষান্ত হলে চলবে না, সে আবেগ যে-বিষয় থেকে সঞ্জাত, যে-পরিস্থিতির উপর আশ্রিত, তার কথাও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যে-বিষয়কে লক্ষ্য করে আমাদের হৃদয়াবেগ দানা বাঁধে সে-বিষয় মনগড়াও তো হতে পারে, বাস্তব জগতে তার কোনো স্থান থাকতেই হবে এমন কী কথা আছে? এটা সম্ভব, এবং রূপকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়া, ননসেন্স ভার্স প্রভৃতির রস এমনিতর রসিকচিত্ত-বিশ্রান্ত, বহির্জগতের কোনো অর্থব্যঞ্জনা না থাকলেও তার লাঘব ঘটে না! লাঘব ঘটে না, কারণ শিল্পের মূল্যায়নে ওজন তার হালকাই। কিন্তু কোনো গুরুভার রসঘন কলাসৃষ্টিকে বহির্বিশ্ব থেকে এমন সম্পর্কছিন্ন করে চিত্তৈকধর্মীরূপে ভাবা যায় না। স্বয়ং অভিনব গুপ্তও শেষ পর্যন্ত তা ভাবতে পারেননি। "অভিনব গুপ্ত যদিও কাব্যের একান্ত তাৎপর্য রসের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে এবং কবি যে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্বভুবনের সত্যকে নিত্য নবোন্মেষিণী বুদ্ধি দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।" (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'কাব্যবিচার' পৃঃ ১৩৪)। পাশ্চাত্ত্য কলাকৈবল্যবাদীদের (art-for-art-sakist) মধ্যে

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চিত্রসমালোচক ক্লাইব্ বেল্ এবং কাব্য-বিচারক ব্র্যাড্লী। বেল্ প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন শিল্পের—অন্ততঃ দৃশ্যশিল্পের—তাৎপর্যকে একান্তভাবে শিল্পবস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে, জীবনের এবং চিত্রবহির্ভূত সমগ্র বস্তুজগতের স্থূলহস্তাবলেপন থেকে সযত্নে রক্ষা করে তার রঙ ও রেখার একটি বিশেষ সংযোজনাকেই চরম জ্ঞান করতে—যার নাম দিয়েছেন তিনি significant form। 'সিগ্নিফিক্যাণ্ট্' শব্দটা একটু গোল বাধায়, কারণ তার মধ্যে ব্যঞ্জক ও ব্যঞ্জিতের দ্বৈত বর্তমান। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে কিসের ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়? "রঙ ও রেখার কোনো-কোনো বিন্যাস আমাদের মনকে এমন গভীর ভাবে নাড়া দেয় কেন—আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি। তার উত্তর হয়তো এই যে সার্থক শিল্পীরা রঙ ও রেখার বিশেষ সন্নিপাতে পরম সত্তারই অনুভব জাগাতে পারেন আমাদের মনে। জানিনা এ-উত্তর গ্রাহ্য কিনা; যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে সিগ্নিফিক্যাণ্ট্ ফর্ম-এর অর্থ সেই ফর্ম যার অন্তরালে আমরা পরম সত্তার আভাস দেখতে পাই।" (ক্লাইব্ বেল্—'ওয়াট ইজ আর্ট' পৃঃ ৫৪)। এবং শেষ পর্যন্ত ক্লাইব্ বেল্ নিজের এই প্রস্তাবে সায় না দিয়ে পারেননি। ব্র্যাড্লী-ও কাব্যেতর কোনো মূল্যের ছোঁয়াচ যাতে কাব্যে না লাগে সেজন্য একান্ত তৎপর। স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন সেইসব মতবাদের যাতে কবিতাকে ধর্মনীতি প্রচারের কিংবা দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশের বাহনরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ উপসংহারে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে উত্তম কাব্যের গভীরতম তাৎপর্য কোনো গহ্বরেষ্ঠ মহাসত্যের দিকে নিয়ে যায় রসিকচিত্তকে।

About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. Its meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it; something

also, which we feel would satisfy not only the imagination but also the whole of us . . . Poetry has in this suggestion, this 'meaning', a great part of its value.—*Oxford Lectures on Poetry, p. 26*

শিল্পীর হৃদয়ান্তঃপুরের অলিগলি ঘুরে আবার আমাদের আসতে হল সেই বাইরের জগতেই। প্রত্যাবর্তনের পথটা কিন্তু বৃত্তাকার নয় স্পাইর‍্যাল, কারণ শিল্পীর কাজ বহির্জগতের অনুকরণ এই প্রাচীন গ্রীক মতবাদে আমরা ফিরে আসছি না অবশ্য। বহির্জগতের উপরিতলবর্তী বাস্তবতার রূপায়ন নয়, তার কোনো গভীর গুহাহিত সাধনদুর্লভ সত্যকে আমাদের হ্লাদৈকময়ী ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পী। হেগেল মনে করতেন যে বিশ্বসত্তার যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে এক পরমতত্ত্ব, সব ক্ষুদ্র খণ্ডিত সত্যের বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব যেখানে ঘুচে গিয়ে পরিপূর্ণ সাযুজ্য—কাজেই পরিপূর্ণ বাস্তবতা—লাভ করেছে। এই পারমার্থিক পারমাত্মিক সত্তার (Absolute Spirit) পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন দার্শনিকেরই সাধ্য ; আর্টের পক্ষে তার আংশিক আভাসটুকু দেওয়াই সম্ভব। তাই তিনি রসোপলব্ধিকে পরাবিদ্যার প্রাথমিক ও অধস্তন স্তরমাত্র বলতে কুণ্ঠিত হননি। শিল্পসৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্যের কথা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছিলেন : দার্শনিক যেখানে পরম-সত্তাকে মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা একটি মহাতত্ত্বরূপেই উপলব্ধি করতে প্রয়াস পান, শিল্পী সেখানে তাকে রূপে রঙে রেখায় ধ্বনিতে মূর্ত ও প্রাণস্পন্দিত করে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ স্থাপন করতে সক্ষম হন। প্রতীয়মান ও বাস্তবসত্তার প্রভেদ মার্কস্‌ও স্বীকার করেছিলেন ; এবং তাঁর মতে সত্তাভাসের উপরিতল থেকে তার অন্তর্নিহিত বাস্তবিকতায় পৌঁছবার প্রকৃষ্ট বাহন ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌, সেই সত্তার যথার্থ স্বরূপ আমরা জানতে পারি মার্কসীয় বিজ্ঞানে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক জড়বাদে। কিন্তু আর্ট-ও সেই একই বাস্তবসত্তাকে তার

নিজস্ব মাধ্যমে প্রতিফলিত করে সহৃদয়ের কাছে উপস্থাপিত করে। হেগেল ও মার্কস্ উভয়ের সমালোচনায় বলতে চাই যে দর্শনবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমই কেবল ভিন্ন নয়, প্রতিফলিত বিষয়েও ভেদ রয়েছে। অর্থাৎ দুয়ের পার্থক্য কেবল আধারগত নয়, অথবা আধারগত পার্থক্য আছে বলেই, তাদের আধেয়-ও এক নয়। বৈজ্ঞানিক সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন নিজের ব্যক্তিপুরুষকে, নিজের ভাবনাবেদনা, ভালোলাগা মন্দলাগাকে তাঁর সত্যান্বেষণ থেকে সরিয়ে রাখতে, তিনি সন্ধান করেন এমন বস্তুসত্তা যা বিষয়ধর্মী সুতরাং বিষয়ীর অনুভব-সাপেক্ষিক নয়, অভিজ্ঞেয় কিন্তু অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে, শিল্পীর জগৎ তাঁর হৃদয়ানুরঞ্জিত, তাঁর আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে পরিস্পন্দিত; তাঁর অন্তর্লোকের সঙ্গে তাঁর বহির্বিশ্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, দ্বৈতাদ্বৈত। কবির ভাষায় বলবো, "মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় অধিকার করছে—তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।" এটা ঠিক যে বিজ্ঞানও চায় মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করে সত্যকে পেতে, শিল্পীর সাধনাও তাই; উভয়ই প্রতীয়মান বস্তু থেকে বাস্তবসত্তার দিকে অভিযাত্রী। কিন্তু এদের সাধনার মার্গ এতই বিভিন্ন, দিকনির্ণয়ের যন্ত্রপাতি, সত্য-নিরূপণের প্রতিমান এমনি বি-সদৃশ যে শেষ পর্যন্ত তাঁরা একই সত্যে গিয়ে পৌঁছন একথা কেবল গায়ের জোরেই বলা যায়, কোনো যুক্তিপ্রমাণের উপর তার ভিত্তি নেই। বিজ্ঞানের সত্য সার্বিক, নিরপেক্ষ, এবং সেই কারণে নির্বস্তুক (abstract); শিল্পীর সত্য ততটা সার্বজনিনতার দাবী রাখে না, কিন্তু অধিকতর বাস্তবিক, কারণ তা অধিকতর মানবিক। অর্থাৎ আমি অনেকান্তবাদে বিশ্বাসী। অবশ্য এই অনেকান্ত সত্যগুলি সকল বিরোধ ও বিচ্ছেদের শেষে হয়তো কোনো এক মহাসত্যে গিয়ে মিলে যায়। কিন্তু সে তো ধর্মবিশ্বাসের কথা, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার। আমাদের মুখে সে-কথা শোভা পায় না—

কোনো ডায়ালেক্‌টিক্‌ জড়বাদীর মুখে তো নয়ই। কাব্যের রসাস্বাদে আমরা বিজ্ঞানের পরিমাণগত সত্যকে উপলব্ধি করি না, বিজ্ঞানের নিয়মতন্ত্রজালে কাব্যের পরিমাণ-বহির্ভূত সত্য ধরা দেয় না। এবং তৃতীয় কোনো নয়নের অধিকারী তো আমরা নই।

আজকের দিনে আমরা মানুষের বাইরে কোনো পরমতত্ত্ব বা চরম-মূল্যের সন্ধান করতে একান্তই অনিচ্ছুক। পশ্চিমী চিত্তজাগরণের পর থেকে ইউরোপে এবং ফলতঃ অন্যান্য দেশেও যে-সব দার্শনিক মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চল হয়েছে— Humanism, Positivism, Utilitarianism, Marxism, Pragmatism প্রভৃতি—সর্বত্রই শোনা যায় মানুষের জয়জয়কার, সমস্ত বিশ্বভুবনের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই সর্বোচ্চ মূল্যের আধার বলে ঘোষণা। কিন্তু সে কোন্‌ মানুষ? চোখ চাইলে চারদিকে এবং নিজেদের মধ্যে যে মানুষকে দেখি তার চরণে তো আমাদের হৃদয়মনের অর্ঘ্যদান করতে পারি না। দেবত্ব তার মধ্যে আছে কিন্তু পশুত্বও রয়েছে সেই পরিমাণে বা ততোধিক, তার মহিমা অবশ্য স্বীকার্য কিন্তু তার বিবিধ প্রকারের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার দিকেই বা চোখ বন্ধ করে থাকি কেমন করে? ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যুগযুগান্তের পটভূমিকায় বিচার করলে অবশ্য দেখা যায় মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে মহতের দিকে, পাশব বৃত্তি থেকে ঐশী প্রেরণার দিকে একটি অনন্ত-যাত্রার পথ রেখায়িত—যদিও সে পথ সর্বত্র ঊর্ধ্বগ নয়, কোথাও কোথাও অধোগামী, কোথাও বা গভীর অরণ্যে দিশাহারা। অর্থাৎ বিগত বা বর্তমান নয়, কোনো এক অনির্দিষ্ট দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের মানুষকেই আমরা পরম মূল্যের আধার বলে বন্দনা করছি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো ভবিতব্যই জানেন, উপস্থিত মুহূর্তে তার চিন্তা অনেকাংশে কল্পনাবিলাস নয় কি? অথবা বর্তমান মানুষের মধ্যে সেই অনাগত পুরুষোত্তমের যে গাণিতিক সম্ভাবনামাত্র দেখতে পাচ্ছি তাতেই আমাদের সমস্ত শ্রেয়বোধের তৃপ্তি-সাধন সম্ভবপর? তবে সন্দেহ

হয় আমাদের ইদানীন্তন অত্যন্ত ব্যবহারিক ও বস্তুনিষ্ঠ মেজাজের সঙ্গে এই সংখ্যাগাণিতিক বিমূর্ত তত্ত্বের প্রতি এতখানি আস্থা বা উচ্ছ্বাস খাপ খাবে কি ?

কিন্তু বর্তমান কালকে কালের অনন্ত ধারা থেকে, মানুষকে সৌরমণ্ডল এবং আরও বৃহত্তর যে-নাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলের সে বাসিন্দা তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার তো কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের ইতিহাসে যে-অশেষ দ্বান্দ্বিক বিবর্তনেব কথা জড়বাদী মার্কস্, এবং Infinite progress and infinite perfectibility of man সম্পর্কে যে কথা ভাববাদী ক্রোচে বলেছেন, তা জড় প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহের আওতায়েই ঘটিত ও ঘটিতব্য। (পদার্থবিজ্ঞান যতই বলুক যে প্রাকৃত জগতের সার্বিক গতি বিশৃঙ্খলার দিকে, তাপমৃত্যু নামক জাগতিক অবক্ষয়ের অভিমুখে ; এবং প্রাণী-লোকের ও মানবেতিহাসের বিবর্তন একটি অপ্রত্যাশিত আপতিক ঘটনা (chance event), ভৌতিক নিয়মের ব্যতিক্রম এমন কি প্রতিক্রম, তবু থার্মোডাইনামিক্সের এই সিদ্ধান্তকে আমিও এডিংটনের অনুগামী হয়ে বৈজ্ঞানিক গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।) বিশ্ব-ব্যাপারকে একান্তভাবে স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল বিধান বা অবিধানের রাজ্য জ্ঞান করার ফলে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের যে-রূপটি কোনো কোনো পদার্থ-বিজ্ঞানীর লেখায় ফুটে ওঠে তা অনেকটা এই প্রকারের :

> There was once a brainy baboon
> Who always breathed down a bassoon;
> For he said, "It appears
> That in billions of years
> I shall certainly hit on a tune."

এ-প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও অসঙ্গত হবে। কৌতূহলী পাঠক এডিংটন প্রণীত 'নিউ পাথওয়েস অব সায়েন্স'

গ্রন্থ থেকে 'দি এণ্ড অব দি ওয়ার্লড্' শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন।

মার্কস্‌বাদীদের মতো আমিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি ডায়লেক্‌টিক্ বিবর্তন-বর্ত্মের অভিযাত্রী বলে জানি। তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে অবশ্য আমি মনে করি না যে এই বিশ্বাসের যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। হয়তো ভবিষ্যতের কোনো হুবাইট্‌হেড্ বা কোনো সোভিয়েৎ মহা-বিজ্ঞানী এমন এক নতুন পদার্থবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হবেন যার সিদ্ধান্ত বিশ্বপ্রগতির অনুকূলে যাবে; কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত মতবিশ্বাসের সমর্থন খুঁজতে হয় দার্শনিক অনুসন্ধিৎসায়; বিশেষতঃ মূল্যদর্শনের গবেষণায়—থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয়-বিধান-বিড়ম্বিত পদার্থবিজ্ঞানে নয়। মার্কসীয় দর্শনের অনুপ্রেরণায় সাম্প্রতিক পদার্থ-বিজ্ঞানের উল্টোমত গ্রহণ করতে আমি বাধ্য হয়েছি, তার কারণ তেমন কোনো মতবাদ ব্যতিরেকে আমাদের শাশ্বত মূল্য-বোধের ভিত্তিভূমি আমি খুঁজে পাই না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে বলব না, কিন্তু অন্যপথ হচ্ছে logical positivist-দের মতো শ্রেয় ও সুন্দরকে ব্যক্তিগত খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া; অথবা পূর্ববর্তী naturalist-দের মতো সমস্ত চরম মূল্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে হয় আমাদের জৈব বৃত্তিগুলিরই সুপরিকল্পিত তৃপ্তিবিধানে।

মানুষ এমনি আশ্চর্য জীব যে যদিও সে জীবমাত্রের মতোই দেহ ও বংশরক্ষায় উদ্যোগী, তবু কেবল প্রাণধারণে তার তৃপ্তি নেই; বরঞ্চ তাতে সে গ্লানিই বোধ করে। এবং অন্ততঃ আজকের দিনে জৈববৃত্তির পূর্ণতম চরিতার্থতাকেও সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরমাত্র জ্ঞান করতে শিখেছে। বলা যেতে পারে যে জীবনের পূর্ণতা জৈববৃত্তির তর্পণে মেলে না, মেলে মানবিক বৃত্তির সার্থক বিকাশে। সে-কথা ঠিক, এবং শিল্প, জ্ঞান, ব্যক্তিক ও সর্বমানবিক প্রেম—এগুলিকেই আমরা বিশিষ্টরূপে মানবিক বৃত্তির সার্থকতা-লাভের ক্ষেত্র বলে জানি। পূর্বোক্ত দুইপ্রকার

(জৈবিক ও মানবিক) বৃত্তির মধ্যে একটি মৌল প্রভেদ লক্ষ্য করবার বিষয়। জৈববৃত্তি অন্ধভাবে নিজের তৃপ্তি অর্থাৎ বাধামুক্ত স্ফুরণ খোঁজে, কিসে তার তৃপ্তি, সে-বস্তুটির প্রকৃতিই বা কি, স্বকীয় মর্যাদাই বা কতখানি, এসবে তার কিছু যায় আসে না। মোটের উপর যা তাকে অধিকতর তৃপ্তি দেবে তার দিকেই তার অধিকতর টান। কিন্তু মানবিক বৃত্তিগুলির সার্থকতা আপনাতে আপনিই সম্পূর্ণ নয়, তার জন্য সে চায় নিজের বাইরে এমন কোনো সত্তার উপলব্ধি যা স্বকীয় মূল্যে ও মহিমায় সমৃদ্ধ বলে তার কাছে প্রতিভাত। জ্ঞেয় বিষয়ের, অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, পরমমূল্য যদি আমরা মনে-মনে স্বীকার না-করি তবে শুদ্ধ জ্ঞান-পিপাসার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। এ কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই যে, ফলিত বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানান্বেষণের ক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র। তেমনি শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যে বহির্বিশ্বকে উপলব্ধি করি তাও আমাদের কাছে অন্যপ্রকার (নান্দনিক বা aesthetic) পরমমূল্যের দাবী নিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রেও পুনরুল্লেখ বাহুল্য যে, শিল্পসাহিত্যে আমরা—শিল্পী ও রসগ্রাহী—আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করি বটে, কিন্তু সে-অনুভূতি একটি নিরালম্ব নিজস্ব ব্যাপার নয়। বাস্তবপলায়নী দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী কলাতত্ত্বের সব চেয়ে বড় অধিবক্তা ক্রোচে-ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে

Feeling is not a particular content, but the whole universe sub specie intuitionis.—*'Essence of Aesthetics', p. 40*

মোটকথা, ঠিক 'মিরর-ইমেজ' না বললেও আমি মার্কস্‌বাদীদের সঙ্গে একমত যে, দর্শনবিজ্ঞান যেমন, শিল্পসাহিত্যও তেমনি কোনো-না-কোনো বাস্তব সত্তারই উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। এবং তারই উপর ভিত্তি করে আমি বলতে চাই যে, শিল্প ও জ্ঞানকে আমরা জীবনে যে-মহৎ মূল্য দিয়ে থাকি তার দ্বারা বাস্তবসত্তার প্রতিই আমাদের পরম-মূল্যবোধ

অভিব্যক্ত হয়। বিজ্ঞান টেক্‌নলজির মারফৎ আমাদের উদ্বর্তনের সহায়তা করে—সেটা তার ব্যবহারিক মূল্য; কিন্তু তার চরমমূল্য পাই যখন সে চরমমূল্যের আধার বিশ্বসত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করে। তেমনি সাহিত্য সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে পারে, শ্রেণীহীন সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করতে পারে—সেটা তার ব্যবহারিক মূল্য। কিন্তু তার প্রকৃত সার্থকতা সেখানেই যেখানে সে মনের সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্য ঘটায়, বিশ্বের যে পরমমূল্যঘন রূপ নৈমিত্তিক জীবনের স্থূল দৃষ্টিতে অনুদ্‌ঘাটিত, রসাভিসিক্ত চিত্তের সম্মুখে তার আবরণ উন্মোচন করে।

মার্কস্‌বাদী হয়তো বলবেন যে, জ্ঞানী এবং শিল্পী যে-বাস্তবসত্তাকে উপলব্ধি করে তাঁদের পরমমূল্যবোধের সার্থকতা খোঁজেন তা সমাজ। অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কথাই তাঁরা বলে থাকেন। ব্যক্তি-মানুষের সম্যক স্ফুরণ অবশ্য সমাজমুখিন এবং সমাজনির্ভর; কিন্তু ব্যক্তির মনকে ছাড়িয়ে তো সমাজের মন বলে কিছু নেই, ব্যক্তি-সমূহের সুখদুঃখ ভালোমন্দের অতিরিক্ত কোনো সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা আমরা ভাবতে পারি না। তাই মার্কসবাদীকেও একথা মানতে হবে—স্বয়ং মার্কস্‌ তো মানতেনই—যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনে values-এর আবির্ভাব (মার্কসের ভাষায় free development of each) না-ঘটলে সমগ্র সমাজেও তা ঘটবে না। তা ছাড়া আগেই বলেছি যে, মনুষ্যসমাজ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, সমাজের মধ্যে যদি পরমমূল্যের উন্মেষ ঘটে থাকে তবে তা জাগতিক নিয়মেই ঘটেছে; সর্বদেশকালে ব্যাপ্ত যে-বৃহত্তর মূল্য সামাজিক মূল্য তারই একটি ঘনীভূত প্রকাশ। এ কথাও বলা হয়েছে যে ব্যক্তিই হোক আর সমাজই হোক, তার বর্তমান অস্তিত্বকে আমরা চরমমূল্যের আধার বলে গ্রহণ করতে পারি না, ভবিষ্যতের পূর্ণতর মূল্যবিকাশের সম্ভাবনারূপেই তার আজকের খণ্ডিত ও বিকৃত সত্তা আমাদের কাছে মূল্যবান। এবং

ক্ষণকালের দৃষ্টিতে যা সম্ভাবনা মাত্র, মহাকালের দৃষ্টিতে তাই বাস্তব। মহাকাল (eternity) কথাটাকে ভাববাদী দর্শনের বাক্যচ্ছটা বলে উড়িয়ে দিলে আমরা আমাদের জীবনের একটি মহৎ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করব। মানুষের মন হচ্ছে সেই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি যা একাধারে ক্ষণকালের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ এবং শাশ্বতকালের প্রশান্তিতে অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্। উপস্থিত মুহূর্ত ও মহাকালের এই দ্বন্দ্বময় সাযুজ্য দার্শনিক চিন্তায় কেবল নয়, সার্থক কাব্যানুভূতির মধ্যেও স্থান পেয়েছে।

> At the still point of the turning world. Neither
> flesh nor fleshless;
> Neither from, nor towards; at the still point,
> there the dance is,
> But neither arrest nor movement. And do not
> call it fixity,
> Where past and future are gathered.
>
> —*T. S. Eliot. 'Four Quartets', p. 9.*

মহাকালের এই স্থিতপ্রজ্ঞ দৃষ্টি কখনও চলতি কালের বহমান অভিজ্ঞতাকে খণ্ডিত করে না, তাকে পরিব্যাপ্তি ও পূর্ণতাই দান করে। যদি কোনো শঙ্করবেদান্তিন্ মহাকালের উপলব্ধিতে বিভোর হয়ে চলতি কালের জগৎকে মায়ার সৃষ্টি বলে উড়িয়ে দিয়ে কর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করবার কথা বলেন, তবে তাঁর কথা তেমনি অগ্রাহ্য হবে যেমন অগ্রাহ্য সেই সব ক্ষণকালবাদীদের কথা যাঁরা ধ্যানী ও জ্ঞানীর প্রতি কটাক্ষ হেনে কেবল কর্মমার্গের উপস্থিতকালনিবদ্ধ সাধনার মন্ত্রই জপে গেছেন—

Philosophers have so far interpreted world; the point is to change it.

'চিরন্তনের দৃষ্টিতে জাগতিক পরমমূল্য যেমন পরিব্যক্ত, চলমানতার পর্যবেক্ষণে তেমনি তার মূল্যহানি, অপূর্ণতা ও অসিদ্ধি সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু কুৎসিতের মধ্যেও সুন্দরকে দেখা, অপূর্ণের মাঝখানেও পূর্ণতার ধ্যান, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসিদ্ধির সম্মুখেও মহতের সাধনার দীপশিখাকে নিভতে না-দেওয়া—এই তো মহাশিল্পীর মৌল প্রেরণা।

We begin to live only when we have conceived life as a tragedy—

অন্ততঃ কবির জীবনে ইয়েট্‌স্‌-এর এই উক্তি আক্ষরিক অর্থে সত্য। ট্র্যাজেডির মানে অবশ্য মূল্যের সার্বিক বিনাশ নয়; সাহিত্যে এবং জীবনে যাঁরা সিনিক বিক্ষোভে জর্জরিত এবং যাঁরা ট্র্যাজিক উপলব্ধির দ্বারা পরিস্নিগ্ধ, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অপরিমেয়। যে কবির চিত্ত পরম-মূল্যের সাক্ষাৎ চেতনায় সমুন্নীত তাঁর চোখেই সে-মূল্যের আংশিক ও ক্ষণিক বিলোপ ট্র্যাজেডিরূপে দেখা দেয়। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে মিড্‌ল্‌টন্‌ মারী লিখেছেন—

When Shakespeare has pronounced that life is 'a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing,' he is not left, as other men would be, naked to the cold wind of eternity.



ব্যক্তিত্বের অনন্তবিকাশ, এবং শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধির সাধনায় ব্যক্তির আত্মোৎসর্গ—এই দুইয়ের মধ্যে যে-বিরোধ চোখে পড়ে সেটা উপরিতলের; অভিজ্ঞতার আরও গভীরে তলিয়ে দেখলে তাদের আশ্চর্য সঙ্গতি অনুভব করা যায়। প্রেমিক যেমন নিজেকে

বিলিয়ে দিয়েই নিজেকে খুঁজে পায়, প্রেমাস্পদের ব্যক্তিসত্তার মূল্য যখন তার কাছে চরম এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ তখনই সে নিজের ব্যক্তিত্বের গভীরতম মূল্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে—এও তেমনি। কবির সঙ্গে প্রেমিকের যে-সমীকরণের কথা শেক্স্পীয়র বলে গেছেন তার সার্থকতা বোধ করি এখানেই। উভয়েব অভিজ্ঞতার মূলে আছে একটি দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিস্ময়। কাব্যের অনুভূতি ও প্রেমের অনুভূতির মধ্যে খুব বড় একটি পার্থক্যের কথাও অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন: প্রেমের বেলা ঔচিত্যের (appropriateness) কোনো প্রশ্ন ওঠে না; অর্থাৎ কারো গভীরতম, পূর্ণতম ভালোবাসা যদি এমন একজন লোকের উপর ন্যস্ত হয় যাকে আমরা—ইতরে জনাঃ—গুণলেশহীন ও নানা দোষে দুষ্ট দেখি, তবু আমরা বলতে পারি না যে এমনটি হওয়া উচিত ছিল না, অথবা সে-ভালোবাসাকে নিছক ভ্রান্তি মনে করে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখি না। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ঔচিত্যের বিচার অনিবার্যতঃই এসে পড়ে। অধম কাব্যকে (ধরুন বটতলা-সাহিত্য-আখ্যাপ্রাপ্ত কোনো রোমাঞ্চ-নাট্যকে) উত্তম জ্ঞানে যদি কারো রসানুভূতি উদ্বেল হয়ে ওঠে তবে কি আমরা বলব না যে এই রসবোধ এখানে ভ্রান্ত ও অনুচিত, সুতরাং নিন্দনীয়? যে-কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টির রসগ্রহণ সম্পর্কে সার্বজনিনতার একটি অনুচ্চারিত দাবী থাকে শিল্পী ও রসিক চিত্তে; সে দাবী প্রতিপন্ন করা যায় না, সর্বত্র স্বীকৃত-ও হয় না, তবু তার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। কিন্তু কোনো প্রেমিক—তার প্রিয়াব অপরিমেয় মূল্য সম্বন্ধে যত দ্বিধাহীন হোক তার নিজের মূল্যায়ন—মনের গোপন কোণেও এমন দাবী পোষণ করে না যে অন্যের মূল্যবিচারে তার সমর্থন পাওয়া যাবেই। তবে এর থেকে যদি এই অনুমান করা হয় যে কাব্যানুভূতি সর্বৈব বিষয়-নিষ্ঠ, তার সত্যমিথ্যা একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মতো

সুস্পষ্ট সীমারেখার দ্বারা বিভক্ত; এবং প্রেম নিতান্ত বিষয়ীগত ও ব্যক্তিগত ব্যাপার, অবাস্তব ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র, তার মধ্যে কোনো যাথার্থ্যের অঙ্গীকার নেই, তাহলে খুবই ভুল করা হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, কবির জগৎ তার মনগড়া জগৎ নয় বটে, কিন্তু তা কবির ও সহৃদয়ের চিত্তনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বস্তুসত্তারূপে পরিগণ্যও নয়; বাইরের বিশ্ব ও মনের ভাবনা-বেদনা তাতে একাকার হয়ে মিশেছে। দার্শনিক পরিভাষায় তাকে বিষয়-বিষয়ীগত বলা যেতে পারে—যদিও এমন কোনো শাস্ত্রীয় প্রয়োগ আমার জানা নেই। আমার বিবেচনায় শিল্পবস্তুর আরও সমুপযুক্ত আখ্যা হবে শঙ্করবেদান্তের (ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) 'সত্যানৃতেমিথুনীকৃত'। এই সত্য ও অনৃত অবশ্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বিচারসম্মত, নইলে কাব্যানুভূতির স্বক্ষেত্রে কবিতাটি সম্পূর্ণই সত্য। প্রেমও এমনি একটি সত্যমিথ্যায় জোড়া-মেলানো ব্যাপার।

প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন মার্কিন দার্শনিক লিখছেন—

Love may be defined as any activity which finds its end and value in the maintenance and increase of value in another mind.—*Parker. 'Human Values,' p. 177.*

সংজ্ঞাটিতে মার্কিনী কর্মপটু ও কর্মপ্রিয় মনের ছাপ খুবই স্পষ্ট; তা না হলে প্রেমের একটি প্রধান দিক যে অক্রিয়, ধ্যানদৃষ্টিনির্ভর (contemplative), যাতে প্রেমাস্পদের জীবনে মূল্যের সংবর্ধন বা সংরক্ষণ নয়, তার ব্যক্তিত্বের স্বকীয় মূল্যকে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করাই বড় কথা—সেদিকটা পার্কারের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যাবে কেন? কোনো বিষয়ের মূল্যকে মূল্যগ্রাহী চেতনার ব্যাপারমাত্র জ্ঞান করা আমার মতে ভুল; কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, তথ্যবস্তুর মতো তা একান্তরূপে বিষয়গত নয়, বিষয়ে অবস্থান করলেও বিষয়ীর অনুভব-সাপেক্ষ। অর্থাৎ মূল্য আছে অথচ কোনো চেতনায় তার উপলব্ধি

ঘটেনি, কোনো রসিক চিত্ত তাকে আপন অনুভবে গ্রহণ করেনি, এমন ভাবা যায় না। ব্যক্তিস্বরূপের মূল্য কিন্তু সেই ব্যক্তিরই উপলব্ধির বিষয় হতে পারে না, তার সমস্ত মূল্যবোধ বহির্মুখী, অন্য বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তির দিকে নির্দেশিত। আপন ব্যক্তিসত্তার মূল্য সম্পর্কে যে-ব্যক্তি আপনিই অবহিত ও রসাভিসিক্ত সে আত্মকেন্দ্রিক এবং অহংপূর্ব হয়ে পড়ে, ফলে তার ব্যক্তিত্বের অবনতি, ব্যক্তিসত্তার মূল্যের অবক্ষয় অনিবার্য। যাকে আমরা বলি মানবপ্রেম বা সৌভ্রাত্রবোধ তাতে অন্য সকল ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি এবং মূল্যগ্রহণ আছে বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার যে-মূল্য, তার যথার্থ উপলব্ধি তাতে নেই। মানবপ্রেমের ভাবখানা অনেকটা এই : তুমি, অর্থাৎ যে কোনো লোক, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ যাই থাক, তাতে আমার কাজ নেই, কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্ব-বিকাশে—যদি তা অন্যের ব্যক্তিত্ববিকাশকে অবরুদ্ধ না করে—আমি সাধ্যমতো তোমার সহায়তা করব।

আমরা যে ভাব ও এষণাকে প্রেম আখ্যা দিয়ে থাকি (মানব-প্রেমের প্রতি তুলনায় যার নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যক্তিগত প্রেম) তাতেই আছে কোনো বিশেষ একজন লোকের ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যের এবং তার স্বকীয় মূল্যের পূর্ণ উপলব্ধি ও রসাস্বাদন। 'যে-কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যাই হোক' ভাব নয় ; অনন্য, অতুলনীয়

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

প্রেমাস্পদের ব্যক্তি স্বরূপের অন্তর্নিহিত মূল্য ও তার বিকাশের বিশিষ্ট পথের অনুসন্ধানই প্রেমিকের সাধনা, সে-ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণতর উন্মেষের জন্য আত্মোৎসর্গ করাতেই প্রেমিকের আনন্দ।

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রেমিক কি প্রেমাস্পদের ব্যক্তিসত্তার কোনো গভীরতর, অন্যের অগোচর, অন্তঃস্বরূপ আবিষ্কার করে, না কি সমস্তই তার মোহমুগ্ধ মনের সৃষ্টি—"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা?" আর্টে যেমন, প্রেমেও তেমনি, কতটুকু আমরা বাইরে থেকে পাই এবং কতখানি অন্তর থেকে যোগাই, তা নিয়ে বিতর্ক চলে না। কলিংউড আর্টের আলোচনায় যা বলেছেন প্রেমের ক্ষেত্রেও অবিকল তাই সত্য :

The distinction between what we find and what we bring is altogether too naive.—*Principles of Art, p. 150.*

শিল্পবস্তু কেবল শিল্পীমনেরই প্রতিচ্ছায়া নয়—সমগ্র বিশ্বভুবনের একটি সত্যরূপ আমরা দেখতে পাই তাতে—পূর্ববর্তী আলোচনার এই সিদ্ধান্তটি সর্ববাদীসম্মত না-হলেও অনেকের কাছে অগ্রাহ্য হবে না বোধ করি। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি বা বোধির অন্ততঃ আংশিক সত্যতা যাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত তাঁরাও কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমিককে অনুরূপ সম্মানে বিভূষিত করতে অনিচ্ছুক। এই অনিচ্ছার মধ্যে একটু অবিচার কি প্রচ্ছন্ন নেই? আমরা নিজের প্রেম ও পরের প্রেমকে ঠিক একই চোখে দেখতে অভ্যস্ত নই। অন্যের প্রেম যখন বিচার্য তখনই আমরা প্রেমাস্পদের যে-রূপটি প্রেমিকের শারীর ও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত, তাকে একজন মোহাবিষ্ট ব্যক্তির খামখেয়াল বা স্বপ্নরচনা বলে উড়িয়ে দিতে আগ্রহশীল। নিজের প্রেমের বেলা অনুরূপ বিচার ও সিদ্ধান্ত সম্ভব ঠেকে না; যদি সম্ভব হয় তবে তা প্রেমের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেই খানিকটা খণ্ডিত করবে। প্রিয়ার অত্যাশ্চর্য শরীর-মনের রূপ আপনারই মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন আপনি, প্রকৃত প্রস্তাবে সে লক্ষজনের মধ্যে অতি সামান্য একজন, রূপে গুণে তুচ্ছাতিতুচ্ছ তার সত্তা—এ কথার শুধু মৌখিক নয়, আন্তরিক স্বীকৃতি আপনার ভালোবাসার মাত্রাগত

এবং খুব সম্ভব গুণগত পরিবর্তন ঘটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। এমনতর মোহমুক্তির পর—যদি একে মোহমুক্তি বলতে চান—তাকে দিয়ে আপনার শারীরিক বাসনা তৃপ্ত হতে পারে, সাংসারিক প্রয়োজন মিটতে পারে, সে আপনার সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ও সচিব হতে পারে, কিন্তু তার প্রতি আপনার হৃদয়াবেগের ভাববিন্যাসে সেই স্বর্গীয় সুষমা আর থাকবে না যা ঐ হৃদয়াবেগকে অন্য সকল অনুভূতি থেকে উন্নীত করে প্রেমের বিশিষ্টতা দান করে।

বলা বাহুল্য আমি সে-জাতীয় কোনো মতবাদ আদৌ স্বীকার করি না যাতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দোহাই পেড়ে প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাকে রিরংসা বা বলৈষণার (will to power) প্রকারভেদে পর্যবসিত করা হয়। প্রেমের সঙ্গে কোনো এক বা একাধিক জৈববৃত্তির সমীকরণ হয় অপবিজ্ঞান নয় অতিবিজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানীর পক্ষে অনধিকারচর্চা। এবং শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ নিজের প্রেমের ক্ষেত্রে এমন কোনো সর্বনাশা তত্ত্ববিলাসে আমাদের মন সায় দেয় না। তার মানে প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টির অন্ততঃ আংশিক সত্যতা আমরা প্রকারান্তরে স্বীকার করে থাকি, সম্পূর্ণ প্রাতিভাসিক বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না ; মেনে নিই যে প্রেম একাধারে অন্ধ এবং তৃতীয় নয়নবিশিষ্ট। কিন্তু এই পর্যন্ত। প্রেমাস্পদের সমস্ত দোষ সম্বন্ধে অন্ধতা, বা তার ব্যক্তিত্বে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ গুণের আরোপ প্রেমের পক্ষে কখনই আবশ্যক নয় ; বস্তুত সেটা প্রেমের নাবালকত্বই প্রতিপন্ন করে। যা অত্যাবশ্যক তা এই যে, সব দোষ ত্রুটি অভাব ও বিকারের অন্তরালে প্রিয়ার রূপ ও ব্যক্তিস্বরূপের গভীর তলে এমন এক পূর্ণতার আবিষ্কার যা অনন্যভাবে তারই, যা অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও প্রেমিকের দৃষ্টিবিভ্রম নয়, বরঞ্চ একমাত্র তারই প্রেমপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির কাছে উদ্ঘাটিতব্য, যার হয়তো সবটা বর্তমান নয়, কতকাংশ ভবিষ্যতের ইঙ্গিতরূপেই পরিলক্ষ্য—ভালোবাসার প্রদীপশিখাই যে ভাবী পূর্ণতার বিকাশের পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাবে তাকে। শিল্পীও তেমনি যখন তার ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেন তখন সুন্দরকেই দেখেন, যদিও তাঁর আশেপাশে মানুষে এবং প্রকৃতিতেও যা কিছু কুৎসিত, গর্হিত ও নিন্দার্হ তাকে অস্বীকার করবার তাঁর প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ মহাকবি আমরা তাঁকেই বলি যাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়েছে—বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ। শুধু পরস্তাৎ নয়, তমসার মাঝখানেও।

আর একদিক দিয়ে প্রেমিক শিল্পীর অথবা শিল্পী প্রেমিকের সগোত্র। আমরা যা কিছু করি নিজের সুখের জন্য করি, আমাদের মহত্তম কর্মেরও চূড়ান্ত অভিপ্রায় আত্মতুষ্টি—এমন একটি চিত্তাকর্ষক মতবাদ গত শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্ত্য চারিত্র-দর্শনে খুবই প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। দর্শন থেকে অনেক পরিমাণে বিচ্যুত হলেও এর প্রভাব দর্শনের পরিধি ছাপিয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের লেখায় এখনও বেশ লক্ষ্য করবার বিষয়। চারিত্রনীতির এই সুখবাদী অপব্যাখ্যায় কলাসৃষ্টির মতো অপেক্ষাকৃত শৌখিনতর কর্মও যে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী। দুশো বছর আগে ড্রাইডেন যে-কথা বলেছিলেন—

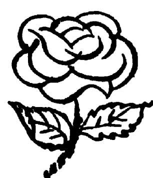
Delight is the chief, if not the only, end of poesy—

নানা কণ্ঠে আজো তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এঁদের পক্ষে স্বভাবতঃই একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রুদ্র বা করুণ রসাত্মক সাহিত্য, King Lear, Crime and Punishment, 'শ্যামা' প্রভৃতির মূল্যায়ন। এসব রচনাপাঠে আমাদের চিত্ত পুলকিত হয় এমন কথা মোটেই বলা যায় না, অথচ সর্বসম্মতিক্রমে কাব্যের মূল্যবিচারে তাদের স্থান খুবই উঁচু পর্যায়ে। অগত্যা এঁরা স্বীকার করেন যে পুলক-সঞ্চারিতা নয়, মহাকাব্যের আছে হ্লাদিনী শক্তি; এবং এই হ্লাদ বা রসানন্দ ও অন্য জাতীয় সুখের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে বাধ্য হন। আমার বিবেচনায় সোজাসুজি বলাই ভালো যে রসের

অনুভূতির জাত আলাদা, সুখ দুঃখের ভাবগ্রামে তার স্থান নেই। প্রেম সম্বন্ধেও কি ঠিক তাই সত্য নয়? প্রেমিক মাত্রেই জানেন প্রেমের আঘাতের মধ্যেও তীব্র আনন্দ এবং আনন্দের মধ্যেও মর্মান্তিক বেদনা ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো রয়েছে। প্রেমানুভূতিও প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখ হর্ষবিষাদাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য বা বোধগম্য নয়, অন্য পর্যায়ের অনুভূতি সে। তাই তো প্রেমের বর্ণালীকে সঠিক বর্ণনা করবার ভাষা খুঁজে পাই না আমরা, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর পরিভাষাও তার উপলব্ধ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে দিশা হারায়। কোনো অবুঝ সখীর কৌতূহলী প্রশ্ন যদি নিতান্তই নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে তবে এ ছাড়া কী-ই বা বলবার থাকে—

সখী, কী পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

—আবু সয়ীদ আইয়ুব



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১ — ১৯৪১)

তুমি

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।



গোধূলি

প্রাসাদভবনে নিচের তলায়
সারাদিন কতমতো
গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত।
সেথা তুমি তব গৃহসীমানায়
বহু মানুষের সনে
শত গাঁঠে বাঁধা কর্মের বন্ধনে।
দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা
ধূসর রক্তরাগে
ঘরের কোণায় দীপ জ্বালাবার আগে ;
নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক
উড়িল আকাশতলে,
শেষ-আলো-আভা মিলায় নদীর জলে
হাওয়া থেমে যায়, বনের শাখায়
আঁধার জড়ায়ে ধরে ;
নির্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লীর স্বরে।

তখন একাকী সব কাজ রাখি
প্রাসাদ-ছাদের ধারে
দাঁড়াও যখন নীরব অন্ধকারে
জানি না তখন কী যে নাম তব,
চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
সুদূর সন্ধ্যাতারা,

সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা।
দিবসরাতির সীমা মিলে যায়;
নেমে এস তারপরে,
ঘরের প্রদীপ আবার জ্বালাও ঘরে।



নির্বাক

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে-কথা আমি বলিনি আর-কারে,
সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু
ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা—
গোপন রাতে উঠেছে তারা দুলি
সুরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুন-পাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল 'গাহো গাহো'।
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া,
ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।
মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারিদিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে,
চাহিনু অনিমিখে।
সহসা মন উঠিল চমকিয়া,
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া,
হেরিনু মুখখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বুঝি।

মুখেতে তব শ্রান্ত এ কি আশা,

শান্তি এ কি, গোপন এ কি প্রীতি,

বাণীবিহীন এ কি ধ্যানের ভাষা,

এ কি সুদূর স্মৃতি।

নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে

স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা—

রহিনু বসি লতাবিতান-কোণে,

কহিনি কোনো কথা।



প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে,

নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল।

চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে।

স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে,

প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।

তব নবজাগরণী প্রথম যে-হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই,
এই আছে মনে।



বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুলগাছে
উঠেছে মালতীলতা।
আষাঢ়ের রসস্পর্শ
লেগেছে অন্তরে তার।
সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিক্কণ হিল্লোলে।
বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
ছোঁয়ায় সোনার-কাঠি অঙ্গে তার,
মজ্জায় কাঁপন লাগে,
শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
যেন কত কী যে কথা নীরবে উৎসুক হয়ে থাকে
শাখাপ্রশাখায়।
এই মৌনমুখরতা
সারারাত্রি অন্ধকারে
ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত,
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে।

আমি একা বসে বসে ভাবি
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা ভাঙা মেঘের সম্মুখে,
বৃষ্টিধোওয়া মধ্যাহ্নের
গোরু-চরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে,
নিবিড় বর্ষণে আর্ত
শ্রাবণের আর্দ্র অন্ধকার রাতে—
নানা কথা ভিড় ক'রে আসে
গহন মনের পথে,
বিবিধ রঙের সাজ,
বিবিধ ভঙ্গীতে আসাযাওয়া —
অন্তরে আমার যেন
ছুটির দিনের কোলাহলে
কথাগুলো মেতেছে খেলায়।

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
ডেকে আনি, কথা পাইনে তো।
কখনো যদি-বা ভুলে কাছে আস
বোবা হয়ে থাকি।
অবারিত সহজ আলাপে
সহজ হাসিতে
হল না তোমার অভ্যর্থনা।
অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
তুমি চলে যাও—
তখন নির্জন অন্ধকারে
ফুটে ওঠে ছন্দে-গাঁথা সুরে-ভরা বাণী ;

পথে তারা উড়ে পড়ে,
যার খুশি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়।



সন্ধ্যা এল

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্ত-সমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।
মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে—
তার নাম করব না—
সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে
ও হয়তো জানে না, কিম্বা হয়তো জানে।

ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির সুরে—
চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকিনে তো সকালবেলার শুকতারাকে—

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;

অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।

একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—

সেই সুরে আমার মন বললে—
সংগীতময় ধরার ধূলি।
আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায়।

আমি ওকে দেখলেম—
যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা।

আমি ওকে দেখলেম
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে ব'লে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে।

সমুখে ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে বাদামগাছের মাথা,
উপরে উঠল কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ।
ডাকলেম নাম ধ'রে।
তীক্ষ্ণবেগে উঠে দাঁড়াল সে,
ভ্রূকুটি করে বললে, আমার দিকে ফিরে—
"এ কী অন্যায়
কেন এলে লুকিয়ে।"
কোনো উত্তর করলেম না।
বললেম না, প্রয়োজন ছিল না এই তুচ্ছ ছলনার।
বললেম না, আজ সহজে বলতে পারতে, এসো,
বলতে পারতে, খুশি হয়েছি।
মধুময়ের উপর পড়ল ধুলার আবরণ।

পরদিন ছিল হাটবার।
জানলায় বসে দেখছি চেয়ে।
রৌদ্র ধু ধু করছে পাশের সেই খোলা ছাদে।
তার স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্তরাত্রের বিহ্বলতা
সে দিয়েছে ঘুচিয়ে।

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাকসবজির ঝুড়িচুপড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়িমালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরীতে।
পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে উঠেছে অশথ,
অন্ধ বৈরাগী তারি ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে—
কাল আসব বলে চলে গেল
আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।—
কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে
ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠছে
যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—
"তাকিয়ে আছি।"

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা,
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে-দেওয়া
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।
বেদমন্ত্রের ছন্দে
আবার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল।
তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।
লোক জমেছে চারিদিকে।
হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এ-ও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।

ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,
ও গাইতে লাগল—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।



মিল-ভাঙা

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে—
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।
আধো-চেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটায় সূক্ষ্ম সোনার কাজ—
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।
মনের মধ্যে তখনও
অসংশয় হয়নি পাখির কাকলী ;

বনের মর্মর একবার জাগে,
একবার যায় মিলিয়ে।

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল
আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।
পাখি যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।
তার মূল্য ছিল তার রচনায়,
নয় তার বস্তুতে।

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়।
মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিংবা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।
যে দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে,
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ

সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

তারপরে অনেক দিন গেছে কেটে।
আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজও তেমনি গন্ধেরই ঘোষণা ;
তোমার সেদিনকার মধ্যাহ্ন
আজ মধ্যাহ্নেও ঘুঘুর ডাকে তেমনি বিরহাতুর।
আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়সহারা এই-সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।

আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে।
দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে
মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে,
চিন্তায়, সাধনায়, আকাঙ্ক্ষায়,
কখনও সফলতায়, কখনও প্রমাদে,
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে—

সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।
সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বস' আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্‌বৃত্ত।
কিন্তু, ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খেপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহুযুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী
আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারার মতো।

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত—
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছি সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।



পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
গত জীবনের কথা,
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।

শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে,
যাক গে সে-কথা যাক গে।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।
কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
মনে দেয় নাই সুখ।
সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
কম কি সে কৌতুক
যতটুকু ছিল ভাগ্যে,
দুঃখের কথা থাক্ গে।

পঞ্চমী তিথি
বনের আড়াল থেকে
দেখা দিয়েছিল
ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে।
মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন,
এ ছল কিসের জন্য।
পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি,
শিকি চাঁদিনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।
বলি আরবার, এসো পঞ্চমী, এসো,
চাপা হাসিটুকু হেসো,

আধখানি বেঁকে ছলনায় ঢেকে
না জানিয়ে ভালোবেসো।
দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,
আমারে করুক ধন্য।

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি,
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস্য।
ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি
সেদিন সে কোন্ ছলে
আপনার ছবি দেখিতে চাহিল
আমার অশ্রুজলে।
এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।
মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।
আজ করো তারি ভাষ্য
যা ছিল অবিশ্বাস্য।

বয়স গিয়েছে,
হাসিবার ক্ষমতাটি
বিধাতা দিয়েছে,
কুয়াশা গিয়েছে কাটি।

দুখদুর্দিন কালো বরনের
মুখোশ করেছে ছিন্ন।
দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি।
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি।
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।



তোমারে দেখি না যবে

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নীচে চুপিচুপি করিছে মন্ত্রণা
স'রে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে ;
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি॥



ভালোবাসা এসেছিল একদিন

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি' ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্যপ্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি' ধাবমান বিদ্রোহের ধারা ॥

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে—
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী ॥



ভক্ত

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।
বাক্যহীন প্রাণীলোক-মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে—
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়,
যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম,
অসীম চৈতন্যলোকে
পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।
দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে ;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না—
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়॥



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১৮৮৮—১৯৫৫)

নিবাসন

মিলন-মলিন ধূলিতললীন
ক্লান্ত এ ভালোবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেদুব
নববিরহের আশায়, বন্ধু !

পাংশু গগনে পাণ্ডুব চাঁদ,
সব-সাধ-মেটা একি অবসাদ !
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্‌বাঁধ
ঢে:ক দাও কালো মেঘে ;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি উঠুক,
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক
ঝড়ের শঙ্কা লেগে।

নিদাঘ রজনী নীরবে দুজনে
জাগি আজ,
তোমারি চরণে জুড়ি চারি কর
নির্বাসনের নবনির্দেশ
মাগি আজ।

আজ মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা
রামগিরি গুহাভবনে।
পথে যেতে যেতে যাক সে কুড়ায়ে
মিলন-মথিত ফুলের মালা,
শিথিল মৌর্বী ভ্রূধনুভ্রষ্ট
ব্যর্থ শরের মৌন জ্বালা।

ভিন্ন করিয়া চুম্বনরত
গততৃষা যত অধরপুট,
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত
অনিমেষ আঁখি পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল
প্রাণান্ত ভুজবন্ধন
অকস্মাতের দমকা হাওয়ায়
দুর্লভ করি বল্লভে—
নবমেঘদূত ভাসিয়া চলুক দেশে দেশে
রুদ্ধ-কক্ষ অলকা ত্যজিয়া
নিবিড়নীল নিরুদ্দেশে!

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ,
ছায়া পড়ে আছে পায়,
ললাটে ক্লান্তি কালিমার টীকা
নির্বাণ করো এ মিলন-শিখা,
দুটি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
নিঃশেষ করো তায়।

বাসি মুখে হাসি পঙ্কজতার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরুভার,
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার
গহন তিমিরতলে,
সেথা সে-আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন—
গোপন দুরাশা জানাই বন্ধু
চারি নয়নের জলে।

শেষ হল নিশা, আশিস মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া,
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া
চলি যায় শুভ'খন,
ক্ষম গো বন্ধু এ মম প্রলাপ,
এবার মিলনে হানো অভিশাপ,
অপলাপ হতে বেঁচে যাক প্রেম
লভিয়া নির্বাসন।



বিচ্ছেদ

আশি বছরের বৃদ্ধের সাথে—
বাঁধন কাটিল সত্তরার
ষাট বৎসর পরে ;
রাঙা শাড়ি সিন্দুর আলতায়
চৌদোলে গেল সত্তরা, একা
অশীতি রহিল ঘরে।

সহসা বৃদ্ধ মোর মুখে চেয়ে—
নিষ্প্রভ আঁখি অশ্রুতে ছেয়ে
ভগ্নকণ্ঠে শুধাল আমায়—
কি করি এখন ক'ন তো ?
শিশিরকীর্ণ স্বচ্ছ প্রভাত
শেফালী-সুরভি বহে শীতবাত,
অকুণ্ঠ নীল অশেষ আকাশ,
উড়ে চলে নীলকণ্ঠ !

চাহিয়া ঊর্ধ্বে করযোড়ে নমি
কহিলাম আমি ডাকি—
উত্তর দাও—নীল গগনের
হে নীলকণ্ঠ পাখি !



মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮৮—১৯৫২)

নিশি-ভোর

তুমি এলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
মুকুলে মুকুলে ফুলের স্বপন
হয়নি ভোর
কৃষ্ণা-তিথির কালো-টুপি-পরা
আধেক চাঁদ
ঝাউবীথি-শিরে দাঁড়ায়ে হেরিছে
ছায়ার ছাঁদ !
দুয়ারে আমার দাঁড়ায়ে অতিথি—
দেখিনি ভালো,
মাটির উপর ছায়াখানি তার
আলোয়-কালো !
দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি
নীলিম ক্ষুধা,
মৃদুবিহসিত অধর-আধারে
রঙিন সুধা !
রজনীগন্ধা ফুলের শাখাটি
শিথিল করে

ছিল বুঝি ? তার সুবাস লভিনু
তন্দ্রাভরে !
নখে মাটি খুঁটি বাজালে নূপুর
অধীর-থির,
আমি শুনেছিনু ঝিঁঝিঁর ঝুমুরে
সে মঞ্জীর !
ছায়ারি নেশায় জেগেছিনু সেই
জ্যোৎস্না-রাতি—
ওগো ছায়াময়ী, সে ছায়া তোমারি
রূপের ভাতি !

তুমি গেলে, যবে উষার আবীরে
ভোরের তারা
চক্ষু আবরি শিশিরে শিশিরে
কাঁদিয়া সারা।
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফোটা-ফুলে-ফুলে মধুপান করে
মধুপ চোর।
নদী-পরপারে আকাশে রাঙায়
রবির আঁখি—
নিমেষে মিলায় অজানার মোহ
যা ছিল বাকি !
যতদূর দেখি—কোথা সেই ছায়া
সজল-কালো ?

তার পাশে সেই ধুতুরা-ধবল
অস্ফুট আলো ?
কোথা সেই রূপ ? চোখ দিয়ে যারে
যায় না ধরা,
যে রূপ রাতের স্বপন-সভায়
স্বয়ম্বরা !
কোথা সেই তুমি ? দেখেছিনু যারে
দেখারও আগে !
সে ছায়া মিলাল—কায়াখানি দেখি
সমুখে জাগে !
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফুটিল মুকুল—ফুলের স্বপন
হল যে ভোর !



জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯—১৯৫৪)

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।



শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন :
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে,
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে :
কাল কিছু হয়েছিল ; হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ ;
বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গা ফড়িং সে-ও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।

'মাটির অনেক নিচে চলে গেছ ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ ? কোন কথা ভাবছ আঁধারে ?
ঐ যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে ;
মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এত বড় অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে—'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।



সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক করে রাখে ; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—
এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।



অঘ্রাণ প্রান্তরে

'জানি আমি তোমার দু চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর
পৃথিবীর পরে—'
বলে চুপে থামলাম, কেবলি অশত্থপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া ;—অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে ;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে' ;—কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে
হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু একটা সজারুর আসা যাওয়া ; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে
চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে ;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন লেগে আছে
বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের ; ঐ সব দূর দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত
জামের শাখায় ;

নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা
ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ...হেঁটে চলি...

আজ কোনো কথা

নেই আর আমাদের ; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে ; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে ; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেধে গিয়ে নড়ে চড়ে ;
পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ ;
আলেয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কি রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায় ; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—তাই-ই ঠিক—ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।



স্বপ্ন

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম বসে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খসে ;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি

উড়ে গেল কুয়াশায়—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি ?

অন্ধকার হাতড়ায়ে ধীরে ধীরে দেশলাই খুঁজি ;
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পার ?

কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিল তাহা ;
এ ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিল, আহা,
সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি রব সেই স্বপ্নের ভিতরে।



ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এই সব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ ;
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।



নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯)

আপন যে জন

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায় ॥
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াষী-বাসনায় ॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথ স্বপনে জোছনায় ॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে মালা—সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায় ॥



আমার গহীন জলের নদী

আমার গহীন জলের নদী !
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি ॥

তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর
চরে এসে বসলাম রে ভাই ভাসালে সে চর।
এখন সব হারায়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি ॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি ॥

তুমি ভাঙ যখন কূল রে নদী ভাঙ একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ রে নদী ছুই কূল ভাঙ তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি ॥



অনেক ছিল বলার

অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন ভালোবাসতে।
পথ ছিল গো চলার, যদি ছু'দিন আগে আসতে।
আজকে মহাসাগর-স্রোতে
চলেছি দূর পারের পথে
ঝরা পাতা হারায় যথা সেই আঁধারে ভাসতে।

গহন রাতি ডাকে আমায় এলে তুমি আজকে
কাঁদিয়ে গেলে হায় গো আমার বিদায় বেলার সাঁঝকে।
আসতে যদি হে অতিথি
ছিল যখন শুক্লা তিথি
ফুটত চাঁপা, সেদিন যদি চৈতালী চাঁদ হাসতে ॥



তুমি এলে কই

গাঙে জোয়ার এল ফিরে তুমি এলে কই
খিড়কি দুয়ার খুলে পথ-পানে চেয়ে রই ॥
কালোজামের ডালের ফাঁকে
আমায় দেখে কোকিল ডাকে
আজও কেন যায় না দেখা তোমার নায়ের ছই ॥

চুল বেঁধে আজ সেজেগুজে পিদিম জ্বালাই সাঁঝে
ঠাকুরঝিরা মুচকি হাসে, আমি মরি লাজে
বাদলা রাতে বৃষ্টি ঝরে
মন যে আমার কেমন করে
আমার চোখের জলে বন্ধু মাঠ করে থই-থই ॥

সজনীকান্ত দাস

(১৯০০)

স্মরণ

আকাশে ছিল মেঘ, নদীর জলে ছিল ঢেউ,
সঙ্গী ছিল যারা তারা তো জানে নাকো কেউ—
দুজনে ছিনু মোরা, মোদের মাঝে ছিল কি যে !

বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, ঝাউয়ের ভিজে শাখা দোলে,
বাঁধানো তটে জল আঘাতে কলতান তোলে ;
অদূরে ম্লান রবি নদীর জলে যায় ডুবে—

তাহারি রঙ লাগে পুবের নীলকালো মেঘে।
ঝিমায় সবে যেন, দুজন মোরা রই জেগে,
জাগিয়া রহে আর ঝাউয়ের শাখে ঝড়ো হাওয়া।

একেলা শুনিলাম তোমার গাওয়া সেই গান,
যে-গান চোখে চোখে আনিয়া দিল সন্ধান—
তোমার মন কবে কাহার গলে দিল মালা।

মানুষ করে ভিড়, নিরালা তবু চারিদিক,
তোমার মুখপানে খানিক চেয়ে অনিমিখ,
কেন যে অকারণ নয়ন ভরে এল জলে !

যা মূক মুখে তব, বুকের তলে সেই বাণী
উঠিল গুমরিয়া তবু না হল জানাজানি,
সবার মাঝখানে তোমারে না নিলাম বুকে।

ফিরিয়া এনু ঘরে অসহ সুখে কাটে রাতি;
তিমির যত গাঢ় তত যে অচপল বাতি—
দিবস যত যায় তোমারে তত পাই কাছে।

তোমার বুকে মোর জেনেছি আছে ঠাঁই পাতা,
বেসুর দুটি প্রাণ সেদিন সুরে হল গাঁথা,
বসিয়া আছি কবে সে সুর গানে হবে গাওয়া!



পথ চলতে ঘাসের ফুল

থম থমে রাত্তির ঝম ঝম বৃষ্টি
ডুবল কি পথ-ঘাট ডুবল কি সৃষ্টি,
ডুবল কি প্রেইরী, হারাল কি খেই রে,
নীল মেঘ-বনানীর আঁধারিল দৃষ্টি।

ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝুপ জলধারা ঝরছে,
দুনিয়ার কলটায় পড়বে যে মরচে,
পাগলা আকাশটার আজ জানি হল কি,
আপনারে নিঃশেষ করবে কি খরচে!

প্রিয়ার আমার মাঝে জল-থৈ-থৈ রে,
এই সালে ছাওয়ানো তো হয় নাই ছই রে।
এলোকেশে ঝরে তার আকাশের কান্না,
চোখে জল ছলছল, মুখে, 'প্রিয়া কই রে?'

আজ সাঁজে চাঁদ সই, উঠল বনের ফাঁকে ধবধবে পথঘাট জোছনায়,
লাগছে আঁধার ঘোর তবু সই চোখে মোর, এসো তুমি জ্বেলে দেবে
রোশনাই।
রূপার ওড়না কার পড়েছে বনের পথে হেথা-হোথা ছোটখাটো টুকরায়,
আবছা আলোক দেখে চম্‌কিয়ে বোকা পাখি থেকে থেকে ওই শোন
ডুকরায়।
হঠাৎ পরশে কার ঝরনার জলধারা কঠিন তুষার হল থম্‌কে,
তিয়াষী বনের পশু জল খেতে সেথা এসে ওই দেখ ফিরে যায় চম্‌কে।
তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু বয়ে যাক ঝরনা,
ডাকছে পাহাড় বন, ডাকছে এ দেহ-মন, ফেলে দিয়ে এস ঘর-করনা।
দুজনে বসব যেথা ফোটা ফুল বাস দেয় নিবিড় আঁধারে লতা-কুঞ্জে,
দেখব মু'খানি তব রহি রহি চম্‌কানো চঞ্চল খদ্যোৎপুঞ্জে।
ডুববে পাহাড় বন ডুবে যাবে জোছনা ধরণীর উন্মাদ নৃত্যে,
অদূর গুহার মুখে সিংহের গর্জন শিহর তুলিবে তব চিত্তে।
চুমায় চুমায় শুধু ছাইব ওষ্ঠাধর ভুল হবে চরাচর সৃষ্টি,
চকিতে হইবে মনে চাঁদ শুধু ঢালে সুধা, সে সুধা তরল আর মিষ্টি।
এস এস এস সখি, ডাকে ওই জ্যোৎস্না ঝরনার কুলু কুলু ছন্দে,
আবছা রূপার আলো আজকে পড়ল বাঁধা ঘন তিমিরের বাহু-বন্ধে।
পূর্ণিমা-চাঁদ ওই উঠল বনের চূড়ে ধবধবে পথ-ঘাট জোছনায়,
আমার নয়নে সখি আঁধার শ্রাবণ রাতি, এস এস জ্বেলে দাও রোশনাই।

অমিয় চক্রবর্তী

(১৯০১)

চিঠি

আমি ভালো আছি। তোমার জাহাজের
উর্ধ্বে নতুন তারার মণ্ডলী—
জলের ম্যাপ মনে এঁকে জায়গা ঠিক করেছি, চঞ্চলি
কত অগণ্য জলে চলে কতটুকু বিন্দু জাহাজ,
তাতেই আমার প্রাণ। আজ
স্বচ্ছ সুয়েজখাল পেরোতে তীর-বালুকায় সন্ধ্যা ঝরল,
রাত্রি করল
জেটিতে নীয়ন লাইট, জ্বলচে পোর্ট সৈয়দ, দুরু দুরু এই চিঠি
হাতে পৌঁছবে কয়লা তোলার শব্দে, গাইড্
ফেরিঅলার পেরিয়ে উগ্র দিঠি
তোমার চেনা নিরালায়, অজানা ডাঙার হাটে
জাহাজের একটি ওঙ্কার দিয়ে মন্থর বৈরাগ্যে
থামার পরে ঘাটে।
এখন আর ভয় করে না মৌমাছি ঘরে চাক বেঁধেচে, রাস্তা চেনা
সারাদিন ভনভন ঘুরচে, আসচে, আহা আসুক, কামড়াবে না।

শূন্য নেই ঘরে। মাটির পাত্রে সেই শাদা সবুজ পদ্ম,
তার কেন্দ্রে জানি
যে শুভশ্রী শুকোবে তার সত্যে আমরা আছি,
তারি সুরভি বাণী।

সেদিন অদৃশ্যপ্রায় লাল বাতির গোলকে চেয়ে,
ভেণ্ডর হুইলর স্টল ভেদ করে এল বেয়ে
দিগন্ত পর্যন্ত শূন্য প্লাটফর্ম। পরে
অসাড় গঙ্গার পুল, স্টীমারের হুইস্‌ল্‌; আবর্তে ঘোরে
স্ট্রাণ্ড রোডের ঘোলা স্রোতে ট্রামের ঘণ্টা, গরুর গাড়ি বোঝাই
সমস্ত শহর, বাড়ি, পেরিয়ে চলে যাই
অবশেষে নিজের দরজা খুলে ঘরে বসেই থাকা।
এল মাটির পাত্রে পদ্মফুল—তোমার পাঠানো—
পুবের জানলায় রাখা,
প্রথম আলোটুকু পায় ভোরে,
রোজ ফুটচে একটু করে।

তোমার এই দেশ। চেয়ে দেখি বাহিরে।
বাহিরে সেই তালগাছটিতে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়চে—
চাও ফিরে।
ডেক্‌-এ উঠে য়ুরোপের প্রথম ঠাণ্ডা হাওয়া কি পাচ্চ?
দুই দেশের
স্পর্শ কি পাও? নিরুদ্দেশের
পারাপারে দুজনার ডাক পাঠাই। উড়ো এই চিঠি সন্ধ্যায়—
সকালে অকূল সমুদ্রে কে কোথায়॥



বিনিময়

তার বদলে পেলে—

সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর

নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর

আলোয় ভরা জল—

ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা

বেগনি মেঘের ওড়া পালটা

ভরল হৃদয়তল—

একলা বুকে সবই মেলে ॥

তার বদলে পেলে—

শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর

খোলা রাস্তা ধুলো পায়ের,

কান্না-হারা হাওয়া—

চেনাকণ্ঠে ডাকল দূরে

সব হারানো এই দুপুরে

ফিরে কেউ-না-চাওয়া।

এও কি রেখে গেলে ॥



শ্রীমান শ্রীমতী

দুজনায় যেতে ঐ নীল সিন্ধু-পাখি ওড়া তীরে

ভালো করত যদি দেখত হলদে বালির অন্যতায়

আলগা পৃথিবী, নিত একান্ত প্রেমের ক্ষণ ঘিরে

মধ্যাহ্ন মাস্তুলে কাঁপা চিক্কন রোদ্দুরে আড় চোখে
বৃহৎ আত্মীয় বিশ্ব : প্রত্যহ সত্তার কিনারায়
ব্রুকলিন থেকে মাঝি যেখানে নৌকো বেয়ে যায়,

ব্যস্ত সংসারের দূরে দূরে জাল ফেলা ; শূন্য চিরে
ঠক্ ঠক্ শব্দ ওঠে হাতুড়ির, লাল ধোঁয়া ঢোকে,
প্রচণ্ড খাটুনি ঐ মিস্ত্রিদের।—কেননা, একদিন

স্বচ্ছ ব্যবধানে বেলা স্রস্ত হয়ে এলাবে যখন
অত্যন্ত দুঃসহ লাগবে দুজনারও বেশির লক্ষণ
মহতীর ছায়া, যদিও উজ্জ্বলতর। সর্বলীন

সেই ঘনিষ্ঠতা ওরা হাতে-হাতে ধরে যাতায়াতে
মুগ্ধ বুকে জানবে যত, কাছে পাবে মৃত্যুলগ্নহীন
আপন প্রাণের ছবি : সিগারেট মুখে বেঞ্চে বসে

না-দাড়ি-কামানো বুড়ো প্রসন্ন রূক্ষ দৃষ্টিপাতে
দেখে সমুদ্রের জল, হঠাৎ জেটির ভিড়ে পশে
মজ্জায় গভীর তারি পরিচয় : ওরা বোঝে, তাই

এই বেলা, সুধায় নিবিড় বেলা, অন্তরঙ্গ তলে
ওদের তন্ময় যেন ছোঁয় আরো ; চলেছি সবাই
মস্ত জাহাজের ভোঁ কাছে দূরে ডাকে যাত্রীদলে ॥



চিরদিন

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো ॥

তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি
প্রহরে প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি।
কুমুদ কহ্লার ভাসে থৈ থৈ জলে,
কোথা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো বৌ,
সানাই বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মত্ততা।
মানুষের প্রাণে তবু অনন্ত ফাল্গুনী—
তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি ॥

বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী ;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্লান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টিপ,
নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার
অবিরহ,

সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্তর ফিরে ফিরে—
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে॥



প্রাণলক্ষ্মী

ক্ষয়ে যাক, ব্যথা মুছে যাক
ওরে ক্ষুধাভরা দেহমন—
পরিপূর্ণা ধরণীর নে রে ধন।
ধান ভরা
প্রাণ ভরা
মাটির আসন
আনন্দের গান ভরা
পাতা থাক, পাতা থাক॥

যাকে চাস, সৃষ্টির সবই পেলে
তাকে মেলে।

বাদ নয়, সাধ নয়,
সব নিয়ে, সব দিয়ে ফেলে।
যেতে যেতে এ জীবনে
শুনে তার ডাক,
বিরহের আলো জ্বেলে
ব্যথা পুড়ে যাক—
সুরের গগনে
সব তৃষা তোর দূরে যাক।
ওরে ক্ষুধাভরা দেহ মন ॥

অচেনাদেশের তটে গোরু চরে,
কচি ঘাস গজিয়েছে বাঁধ ভরে।
থামা ট্রেন থেকে দেখি গাছতলে
গাঁয়ের বসতি, হাট, লোক চলে—
নিরাসক্ত সংসারের বাজে শাঁখ
তারই মুখ দেখি যে অবাক ॥

ক্ষয়ে যাক, ব্যথা মুছে যাক—
চাওয়ার বেদন হোক অরুণ রতন
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিক দেহমন।
খসে গিয়ে সব দাবি
তখন হঠাৎ তাকে পাবি।
পুড়িয়ে জীবন আলোময়
প্রাণের ধনকে হবে জয়,
চিরদিন রবে সে আপন।
ওরে ক্ষুধাভরা দেহ মন ॥

মনীশ ঘটক

(১৯০১)

চিলেকোঠা

চিলেকোঠা ভরে এল ডিগ্‌রিয়ার ছায়ায়
পথের ধারে ঝিমধরা কুকুরের মতো শ্রান্ত ডিগ্‌রিয়ার ছায়ায়।
দাঁড়োয়ার চকচকে রূপালী রূপ ম্লান হয়ে এল,
মলিন হল খোয়াইয়ের রুক্ষ আমন্ত্রণ।

গুম্‌টিতে পশ্চিমের গাড়ির প্যাসেঞ্জার নামল,
বোঁচকা বুঁচকির জঞ্জাল সমেত
পাড়ি দিল যমুনাজোড়ের রাস্তায়—
হোসেনি গাড়োয়ানের আড়গড়ার ধার দিয়ে,
ইউক্যালিপ্টাসের সুগন্ধি সঙ্কেতে পথ চিনে।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা থামল।
থামল নন্দন পাহাড়ের চূড়ায়
দপ করে জ্বলা আলেয়ার আলো।
কেবল রইল জেগে
ছুটি বুকের ওঠানামা,

বন্ধ কোঠায়,
ছাদের চিলেকোঠায়।

বাইরে নক্ষত্রখচিত আকাশের নৈমিত্তিক নিঃস্বন।
চাঁদের গান,
তারার গান,
মহুয়ার আর আমের বোলের গান।
রোহিণীর রাস্তা ধরে হাটফিরতি পসারিণীর গান।
ফাল্গুন শেষের তপ্ত সন্ধ্যার গান।

বন্ধ কোঠায়,
ছাদের চিলেকোঠায়,
বাহুবন্ধে দেহলতার গান,
শিরায় শিরায় রক্তকণার গান,
ঠোঁটের কাঁপন, ঠোঁটের কাঁপন

সাক্ষী রইল ডিগ্‌রিয়া।



সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

(১৯০১)

শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকোচুরি খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি ;
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা ;
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—

সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে॥

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে ;
অধরা আবার ডাকে সুধাসঙ্কেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম ,
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;

আজি সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না॥



শর্বরী

সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে।
বিরহের অবরোধে হয়েছিল মিলন স্বগত ;
বাস্তববিবাগী আঁখি প্রেমাশ্রুর মায়াবী অঞ্জনে
আচম্বিতে সনির্বন্ধ, অচিরাৎ স্বপ্নজাগরূক।
ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে-দিন—
অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক ;
পথলুপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যদি পড়ুক তুহিন ;
শুষ্ক সরোজিনী ছেড়ে, উড়ে যাক সপ্তসিন্ধুপারে
যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে ;
তবু কিছু হারাবে না। মরণের অমৃত বিকারে
স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি ম'জে,
অপ্রমেয় পারিজাত কল্পলতাবিতানে ফোটাবে।
কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু সেও স্বরূপে বিশ্বাসী ;
তাই তার গুহাচিত্রে মৃৎপ্রদীপপরম্পরা পাবে
নিবাত, নিষ্কম্প দীপ্তি। ক্ষেমঙ্কর সে-মহাসন্ন্যাসী
বৃত্তিবিবর্তিত শূন্যে চলে গেলে কর্মের প্রসাদে,

অনুপূর্ব তীর্থযাত্রী, যুগে যুগে পুণ্য পীঠে জ'মে,
ধূমাঙ্কিত চিত্তচৈত্য ভরে নেবে বর্ণাঢ্য প্রবাদে ॥

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
বাদুড় বানায় বাসা ; কালপেঁচা আনাচে কানাচে
ইঁদুরের ধ্যান করে ; কোণে কোণে অর্ধভুক্ত শব
লুকায় হিসাবী শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
মহীলতা জোট বাঁধে ; মধ্যে মধ্যে তুষ্ট জরদ্গব
জুড়ায় অম্লের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে বসে।
তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
চাপা পড়ে নিরন্তর ; নোনা লেগে, চূর্ণলেপ খসে,
হাসে অস্থিসার শিলা। সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক
ক্বচিৎ সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
পণ্যস্ত্রীর হাত ধ'রে ; আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে,
ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
দলে বৈদেহীর উরু ; ছেঁড়া পাতা, ভাঙা টিন ফেলে,
সায়াহ্নে শহরে ফেরে। প্রদোষের নির্বেদ বাড়ায়
বিক্ষিপ্ত অঙ্গার, ভস্ম, অতিক্রান্ত উৎসবের গ্লানি।
তার পরে হাওয়া ওঠে, শুকতারা হঠাৎ হারায়,
দুঃস্বপ্নের বিপর্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি ॥



দুঃসময়

মোদের সাক্ষাৎ হলো অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,
সমুত্থিত দৈবদুর্বিপাকে।—
আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অম্বরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশমুকুরে ;
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে
ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে ;
আসে নাই সন্ধিলগ্ন, অমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে ॥

জানো না কি, নিঃশঙ্কিনী, যদিও বা সত্য হয় আজ
আমাদের অবোধ স্বপন,
যদিও মার্জনা করে ঈর্ষাপর ক্লীবের সমাজ
যুগলের অমর্ত্য মিলন,
তথাপি নিষ্ফল সবই।—আমাদেরই দুর্মর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত ;
প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ ;
অহৈতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চনার লাজ
আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন ॥

তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে,
কায়-মনে তোমারেই চাই।

জানি স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে
রাত্রি-দিন মিনতি জানাই।
উন্মথি হৃদয়সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে,
অভুক্তিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে ;
মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকি আছে, এসো আজ তাতে
আমাদের অমরা সাজাই।
অসাধ্যসিদ্ধির যুগ ফিরিবে না, জানি, এ সংসারে ;
তবু রুদ্র ভবিষ্যতে চাই ॥

আঁধার ঘনায় চোখে, তুমি ছাড়া কেহ নেই পাশে,
অন্তরীক্ষে জমে বিভীষিকা।
লুব্ধ ভবিতব্যতারে রুদ্ধ করো দৃপ্ত পরিহাসে,
হাতে হাত রাখো, সাহসিকা।
তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি
ফিরাবে, অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি,
মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল দিবে বুঝি মোরে অব্যাহতি,
শাপমুক্ত হবে অহমিকা ;
নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উল্লাসে
আমাদের নব নীহারিকা ॥



প্রত্যাখ্যান

আমার মনের বনের সঙ্গোপনে
যেই পারিজাত ফুটে উঠেছিল স্বত ;
অনিবারণীয় ঋতুপরিবর্তনে
যার মাধুরিমা হয় নাই অপগত ;

কালবৈশাখী-আরোহী দণ্ডপাণি
পথের ধূলায় পাড়িতে পারেনি যারে ;
রূঢ় নিদাঘের পিপাসাপীড়িত হানি
শোষণ করেনি যে-সৎ স্নিগ্ধতারে ;

ভরা বাদলের অনুচিত প্রশ্রয়ে
উথলেনি যার হৃদয় আচম্বিতে ;
চাহেনি যে ভাগ শরতের অপচয়ে ;
কীটের উদর ভরায়নি কভু শীতে ;

নব বসন্তে নায়িকানির্বিশেষে
দিইনি যে-ফুল ক্ষণিকার হাতে তুলে ;
সে-কুসুমে রচি অঞ্জলি অক্লেশে,
রাখিয়াছিলাম তোমার চরণমূলে।

একবার তুমি তাকালে না তার পানে,
গন্ধে পরাগে নিলে না নিজেরে ভরি ;
কর্ণিকাসার তাই সে দিনাবসানে ;
ত্রিসীমায় আর আসিবে না মধুকরী।

নান্দীমুখ

তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে,
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে,
পুষ্পিত তৃণদলে।
শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে ;
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে ;
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটীকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান,
গান বিরচিব ব'লে ॥

তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা :
আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর,
মৎসর প্রেত-পারা,
প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে,
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে ;
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তার হানাতে।
প্রচ্ছদে ওই ছায়াপাত করে কারা ?
কী নাম শুধাই—উত্তর নাই ;
ঝরে শুধু বারিধারা ॥

মুখে একবার তাকায়ে নির্নিমেষে,
শূন্যোদ্ভব দেব, না দানব,
আবার শূন্যে মেশে।
বুঝি তারা শুধু কুজ্ঝটিকার চাতুরী :

তবু তুলনায় ধন্ধ জাগায় মাথুরই ;
প্রতীকপ্রতিম তাদের কাস্তে, হাতুড়ি
ফসল মুড়ায়, মানমন্দির পেষে।
মূর্ত নিষেধ, মূক নির্বেদ
তাকায় নির্নিমেষে ॥

কখনও কখনও মনে হয় যেন চিনি—
বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা
চীনে পটে বন্দিনী।
স্পেনেও হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী ;
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি,
পশে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন ;
অথচ তাদের চিনি ॥

ভালোবেসেছিল তারাও, আমার মতো,
সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট্,
তারারাশি বাতাহত।
গড্ডলিকার সহবাসে উত্যক্ত,
তারা খুঁজেছিল সাযুজ্য সংরক্ত ;
কল্পতরুর নত শাখে সংসক্ত
শুক্ল শশীরে ভেবেছিল করগত।
নগরে কেবল সেবিল গরল
তারাও, আমার মতো ॥

কিন্তু শূন্যে ছড়ায়ে উর্ণাজাল,
মধুমক্ষীরে উপহাসে ঘিরে
জাগ্রত মহাকাল।
জনপ্রাণীও পারে না তা থেকে পলাতে ;
পোড়ে মৌচাক আধিদৈবিক অলাতে ;
নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে
অপস্থৃত হয় গুপ্তির জঞ্জাল।
কানা মাছি উড়ে ; ত্রিভুবন জুড়ে
কালের উর্ণাজাল ॥

তাই আমাদের সমাহিত অভিসারে
ঘটে দুর্গতি ; মৌন অরতি
সঙ্কেত প্রতিহারে।
বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে
অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলখ নিষাদে।
বুঝেও বুঝি না নিরাকার আঁখি কী সাধে,
প্ররোচিত করে ত্যাগে, না অঙ্গীকারে।
মাগে প্রতিশোধ, মানায় প্রবোধ,
অনিকেত অভিসারে ॥

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে ;
নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,
ভ'রে রবে বাসী শবে।
অশক্য পিতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন ;
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য

তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।

স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে

শুদ্ধির তাণ্ডবে॥



প্রমথনাথ বিশী

(১৯০২)

শীতের পদ্মা

পুরানো দিনের পায়ের চিহ্ন খুঁজি এই নদীতটে
আজি চলিয়াছি বটে।

সেই পথঘাট, ধান-কাটা মাঠ
শীত-সন্ধ্যায় ধূসর বিরাট,
পদ্মার চর,—পদ্মা ভরাট
স্তিমিত মন্ত্র গায় রে,
হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে ত্বজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে।

হেরি চারিধারে আঁধার ঘনায়,
শুধু দিগন্তে অস্তসীমায়
ঝামা আলোটুকু মিলায় মিলায়
মেঘে আর কুয়াশায় রে,
হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে ত্বজনে যায় রে

চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে।

৩

পীতাভ বালুর তীরেতে শয়ান
পদ্মার আজি স্বপ্ন-প্রয়াণ,
ধ্যানে নেহারিছে তারকাটি ম্লান
ধরিল কি রূপ হৃদয়াকাশে
পল্লীর শিরে বেণুবন-ছায়
ধূমকুণ্ডলী শয্যা বিছায়,
শেষ গাড়ি ধান গৃহমুখে যায়,
আর্ত করুণ শব্দ আসে।

হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে॥



বলো, বলো, বলো

তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো
ওইখানে তোমার জিত।
আমি তোমার মনের কথা
জানতে পারলাম কই ?
আপন অন্তরের অগাধ রহস্যের মধ্যে বসে আছো
অমাবস্যার করপুটে

দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাটির মতো,
ঠিক এতটুকু আলো
যাতে দেখা না দিয়েও দেখতে পারো অনায়াসে

সত্যি তোমায় জানতে পারলাম কই ?

যদি বলি তোমায় ভালোবাসি,
তুমি হাসো।
যদি শুধাই আমায় ভালোবাসো ?
বলো—না।
এত নিশ্চিত, এত অসংশয়।
মরুভূমির সূর্যোদয়ও বুঝি
এত নিষ্কলুষ নয়।
যদি বলি কেন ভালোবাসো না ?
অমনি বলো কেনর উত্তর নেই।

এত দিনেও ওই প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না।
ছোট একটি প্রশ্নের কি মহতী সম্ভাবনা।
কেবলি শুধাই, কেন, কেন, কেন ?
কেবলি উত্তর পাই, কেনর আবার উত্তর কি ?

ওই উত্তরহীন উত্তর দেবার সময়ে
কখনো মুখ তুলে চাওনি।
হঠাৎ একদিন চোখে চোখে গেল ঠেকে,
প্রত্যাশিত উত্তর গেল বেধে,
শুধু বললে—তুমি না কবি ?

বললে, কবিরা নাকি অন্তর্যামী।

না গো না, তবে আমিও বলি,
আমি কবি নই, শিল্পী নই,
আমি অন্তর্যামী নই।
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই,
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার দুই চোখে প্রস্ফুটিত
মানস সরের অন্তর্ভেদী
উত্থিত, উদ্গত উদ্ধত পূর্ণায়ত পদ্মটির মতো।

আমি মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত,
তোমার বসনে ভূষণে,
নয়নে অধরে,
তোমার সিঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নখাগ্র অবধি
সূর্যকিরণে কচি নারিকেলগুচ্ছ
যেমন চোখ ঝলসিয়ে দিতে থাকে, তেমনি।
প্রসারিত পদ্মপত্রের মসৃণ নীলিমায়
সেই কথাটি টলোমলো ক'রে উঠুক
তোমার অন্তরের শুক্তিনিঃসৃত
একটিমাত্র মুক্তার মতো।
বলো, বলো, বলো॥



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১৯০৪)

প্রথম যখন দেখা হয়েছিল

প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, কয়েছিলে মৃদুভাষে
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল তো—কিছুতে মনে না আসে।
কালি পূর্ণিমা রাতে
ঘুমায়ে ছিলে কি আমার আতুর নয়নের বিছানাতে ?
মোর জীবনের হে রাজপুত্র, বুকের মধ্যমণি,
প্রতি নিঃশ্বাসে শুনেছি তোমার স্তব্ধ পদধ্বনি !
তখনো হয়তো আঁধার কাটেনি—সৃষ্টির শৈশব,
এলে তরুণীর বুকে হে প্রথম অরুণের অনুভব !'
আমি বলেছিনু : 'জানি,
স্তবগুঞ্জন তুলি তোরে ঘিরে হে মোর মক্ষিরানী !
যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিদ্রাহীন,'
দুচোখে দুচোখ পাতিয়া শুধালে : 'কোথা ছিলে এতদিন ?'
লঘু দুটি বাহু মেলে
মোর বলিবার আগেই বলিলে : 'যেয়ো না আমারে ফেলে।'
আজি ভাবি বসে বহুদিন পরে ফের যদি দেখা হয়,
তেমনি দুচোখে বিশ্বাসাতীত জাগিবে কি বিস্ময় ?
কহিবে কি মৃদুহাসে :
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল তো—কিছুতে মনে না আসে॥'



একটি স্তব্ধতা

যত কথা বলেছিলে ভুলে গেছি সব কথা তার,
যাহা কিছু বলো নাই শুনি তার নিঃশব্দ ঝঙ্কার।
কথার করুণ চাঁদ ঘুমাইতো অধরের কোলে,
ছোট ছোট কথাগুলি উদ্ভাসিতো কবোষ্ণ কপোলে।
উড়িত কথার পাখি নয়নের নভে অগণন,
চুলে তব মর্মরিতো এলোমেলো কথার কানন।
নামিতো কথার জ্যোৎস্না, ভরে যেতো রাশি-রাশি ফুলে,
উচ্ছল বুকের মুখে, অনর্গল ভুরুতে, আঙুলে।
রেখায়-রেখায় কথা, লীলায়িত আঁকা-বাঁকা সাপ :
মেলিতে শরীরময় রোমাঞ্চিত কথার কলাপ।
প্রেমের মরুভূ পরে উড়াইতে কথার সিকতা
সে-সকল ভুলে গেছি, ভুলে গেছি সব তার কথা।
আজ যদি কোনোদিন তব কথা পড়ে মোর মনে,
স্তব্ধতার শব্দ শুনি মৃতপক্ষ পাখির গগনে।
তোমার ছবিটি আজ রেখাহীন, নিশ্চিহ্ন, ধূসর,
জেগেছে কথার জলে স্তব্ধতার শাদা বালুচর।
কী ললিত লতাভঙ্গি রেখেছিলে শাড়িতে জড়ায়ে,
লাল, নীল, মনে নাই, কী ব্লাউজ দিয়েছিলে গায়ে ;
চুলগুলি খোঁপা-বাঁধা, না-বা ছিলো কাঁধে অগোছালো,
মুখে এসে পড়েছিলো কার ম্লান চুম্বনের আলো ;
ঠোঁটের হাসির পরে স্বপ্নসম সুষুপ্ত বেদনা,
বিষের মতন মধু কোনো আশা ছিলো কি ছিলো না
সব তার ভুলে গেছি। আছে শুধু একটি স্তব্ধতা,
তার তীব্র শূন্যতায় শুনিতেছি উজ্জ্বল শুভ্রতা।

অন্নদাশঙ্কর রায়

(১৯০৪)

ক্রীড়া

মনের কথা মনের মতন করে
কইব আমার মনের মতনকে
কবি হবার নাই দুরাশা ওরে
সার মেনেছি সত্য কথনকে।
দৈব যদি হয় রে অনুকূল
আয়ুস্ যদি আশার মতো হয়
ফুটিয়ে যাব সকল ক'টি ফুল
জানিয়ে যাব পূর্ণ পরিচয়।
যশ অপযশ এখন হতে কেন?
হয়নি আজো চরম দানের দিন
কীর্তিরে ভাই ভুলতে পারি যেন
নইলে আমার কীর্তি হবে ক্ষীণ।
মিথ্যা করিস শক্তি পরিমাপ
মোর তুলনা খুঁজিস বৃথা রে।
একটি প্রাণে রইলো প্রাণের ছাপ
ঐ তো আমার কুশলিতা রে।
সবার মাঝে না যদি হই বড়
একটি হিয়ার শ্রদ্ধা যেন লভি
প্রিয়ার কাছে হইলে প্রিয়তর
হলেম আমি যা হতে চাই সবি।

অপরাজিতা দেবী

(১৯০৪)

অভিমানিনী

চিঠির জবাবটাও সাত দিনে পাইনি।...
যাঃও যাও!—কৈফৎ শুনতে তো চাইনি!!
ঢের হয়েছে গো থাক! আর নেই দরকার!
বড়ো কড়া মেয়ে এই সুলতিকা সরকার।
মিঠে মিঠে বুলি শুনে ভুলে যাব ভেব না
এ জীবনে কক্ষনো আর চিঠি দেব না।...
ব্যস্ত বেজায় ছিলে? তা কি আমি জানি না?
বান্ধবী এসেছিল সেই বীণাপাণি না?
তাঁর ফ্যাই ফরমাজে ব্যস্ত তো থাকবেই!
জিজ্ঞাসা করি যদি, অমনি তা ঢাকবেই।
কি এনেচ? সেণ্ট্, ক্রিম? না না, আর চাইনে
চকোলেট? আজকাল আর তো ও খাইনে।
শরত্‌বাবুর লেখা নতুন নভেল?—যাক;
পড়া বাকি নেই ওটা, লাইব্রেরী বেঁচে থাক।
এনেচ খোঁপার ক্লিপ্? বাঁধিনেকো চুল তো!
সাত দিনে চিঠি দিতে যে মানুষ ভুলতো—
তার আনা উপহার যে নেয় সে নিকগে—

আমি তো নেব না !—আর যাকে খুশি দিক্‌গে !
ফিরিয়ে নে যাও এই আংটি ও ব্রোচটা !
মিছে কেন রেখে দেব স্মৃতিতে এ খোঁচটা !
বন্ধুতা ?···বোঝা গেছে। হবে নাকো বলতে !
স্বপ্নেও জানিনিকো—এত জানো ছলতে ॥



জসীম উদ্দীন

(১৯০৪)

একখানি হাসি

দিন ভর তার বহু কাজ ছিল, এখানে ওখানে ফিরি,
যত্নে ও স্নেহে কাজের মধ্যে ফুটাইতেছিল ছিরি।
মোরে ডাকি কথা বলিবে কখন ? ব্রজের পথের পরে,
সারা দিনমান আঁটঘাঁট বেঁধে জটিলা কুটিলা ঘোরে।
এ দেশের সব উল্টো ব্যাভার, হাটে হাটে দাও ঢোল,
কেউ শুনিবে না, কেউ আসিবে না বাধাইতে তাহে গোল।
কানে কানে কথা বলিবে যখনি অমনি সকলে আসি
না শুনেও তার টীকা-টিপ্পনী বানাইবে রাশি রাশি।
জোরে যাহা বল, কারো ভ্রূক্ষেপ হইবে না শুনিবারে
চুপি চুপি তাহা বলে দেখ দেখি কজন না শুনে পারে ?

জগৎ জুড়িয়া করে কোলাহল মল্লিনাথের মিতা,
গোপন কথার ভাষ্য লিখিছে লইয়া নীতির ফিতা।
তবু এরি মাঝে এক কোণে সে যে দাঁড়াল আমারে দেখি,
গোলাপের মতো দুটি রাঙা ঠোঁটে একখানা হাসি লেখি।
একখানা হাসি,—যেন আকাশের একখানা মেঘ ছেয়ে,
পূর্ণ চাঁদের জোছনার জল পড়ছিল বেয়ে বেয়ে।
যেন প্রভাতের সোনালী আলোক বাঁধিয়া পাখার গায়

এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলেছিল আকাশের কিনারায়।
যেন গাঁর বধূ প্রদীপ ভাসায়ে গাঁয়ের ঘাটের জলে,
কাঁকন বাজায়ে কলস হেলায়ে দূর পথে গেল চলে।

আজিকে তাহার বহু কাজ ছিল, মোরও ছিল ব্যস্ততা,
সবগুলি তার জড়াইয়া দিল একটি হাসির লতা—
সেই লতা 'পরে ফুল ফুটেছিল, তাতে বসে মধুকর,
কথায় কথায় জোড়া দিতেছিল সোহাগের তাজ-ঘর।
একখানি হাসি দেখেছিনু তার, যেন বহুদিন পরে,
দূর দেশ হতে অতি চেনা কেউ চিঠি লিখিয়াছে মোরে।
একখানি হাসি! আকাশ হইতে একটি পাখির গান,
দুপুরের রোদে লাঙল চষিতে জুড়ালো চাষীর কান।
একখানি হাসি! গংকিনীজলে যেন বেহুলার ভেলা,
লখীন্দরের শবদেহ লয়ে কোথায় করেছে মেলা।
যেন আকশের বুকে ভেসে যায় একটি রঙিন ঘুড়ি।—
তারি 'পরে যেন বক্ষ রাখিয়া কোথা হাওয়া যায় উড়ি।
একখানা হাসি! নহে বহু কথা, নহে প্রিয়, প্রিয়তম,
প্রাণবল্লভ যদিও লেখেনি, নহে তার চেয়ে কম।

ও-যেন কথার গীতগোবিন্দ! হাফেজের বুলবুলি,
ওরি মাঝে বসি পাখায় মাখায় তারা গুঁড়ো-করা ধূলি।
একখানি হাসি! বাঁকা তরী বেয়ে এসেছে ঈদের চান্,
যেন তারি গায় লেখা রহিয়াছে ভেস্তের ফর্‌মান।



প্রতিদান

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী ;—
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি ;
সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখি, তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।



হুমায়ুন কবীর

(১৯০৪)

একদিন

একদিন যারা কাছে ছিল, ছিল প্রিয়
কালের প্রবাহে সখি তাদের ভুলিও।
জীবনের বন্ধুর তরঙ্গাকুল পথে
হয়তো বাঁকের শেষে দৃষ্টিপথ হতে
অকস্মাৎ চলে যায়,—যেমনি সহসা
একদিন এসেছিলে। নিশির তমসা
মূর্তিখানি হয়তো মুছিল অন্ধকারে
তুমি এলে লক্ষ্য ধরি রাত্রি পরপারে।

যারা ছিল প্রিয় একদিন, আজি তারা
কেবল মনের স্মৃতি ক্ষীণ,—বস্তুহারা
দেহহীন প্রেত! স্মৃতির কঙ্কাল টানি
প্রেম নাহি বাঁচে, শুধু চিত্তে বাড়ে গ্লানি
পুরাতন প্রেম যদি আজি ছায়া সম
নামুক হৃদয় ছেয়ে বিস্মৃতির তম।



আমি যারে ভালোবাসি

আমি যারে ভালোবাসি সে যদি থাকিত হেথা আজি
তবে এই মধ্যাহ্নের রৌদ্রস্নাত শ্যাম তরুরাজি
ভরিয়া উঠিত পুষ্পে, নিদাঘের নির্মেঘ গগনে
হৃদয় মুখরি মম বাঁশরি বাজিত ক্ষণে ক্ষণে।
আলোছায়া-রচা পথে বাতাসে পাইন গন্ধ ভাসে।
দূর হতে কলকণ্ঠে কপট কলহ ধ্বনি আসে।
হাসি কথা গানে সুরে মধ্যাহ্নের পরিপূর্ণ ক্ষণ
অপূর্ব ঐশ্বর্যভারে ভরি দিত সকল জীবন।

সে যদি থাকিত কাছে! এ দূর প্রবাস দেশে বসি
সকল হৃদয় ভরি একটি নিঃশ্বাস পড়ে খসি।
উষ্ণ নিদাঘের আলো আনে বহি সুখস্বপ্নছবি
মাথায় ভরিয়া ওঠে গিরিদেশ কানন অটবী।
সময় হারায় গতি অচঞ্চল স্তব্ধ হয়ে থাকে
নিদ্রিত পাইন বনে নিদ্রালস পাখি কোথা ডাকে।



হেমচন্দ্র বাগচী

(১৯০৪)

মুগ্ধা

মুগ্ধে, এত ঐশ্বর্য তোমার ?
চেয়ে চেয়ে চোখের পলক যেন আর পড়ে না।
এত স্তব্ধ তুমি, মনে হয় ঘুঘুর ডাকের মধ্যেও
এত অলস স্তব্ধতা নেই।
স্থির হয়ে আছি
সমস্ত দেহ মন
একটি অপূর্ব আনন্দ-চেতনার কেন্দ্রে আত্মহারা।
তিল তিল সামান্যকে নিয়ে তুমি অসামান্যা।
আমাকে শতধা বিচ্ছিন্ন করেও আশা মেটে না কিছুতেই।



ভাঙা কোঠাবাড়ি

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি,
কাঁঠাল আম নারকেলের বাগান,
তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে
শ্যামল বনশোভার মতো,
মনের পীড়া যে দূর করে—এমন মেয়ে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৬)

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে !
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হল আজ সুনীল উৎসব !

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাকো ;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মতো রোদ।

গলানো সোনার মতো
রোদ পড়ে সব ভাবনায় ;
সোনার পাখায়,
গাহন করিতে ওঠে

নীল বাতাসের স্রোতে,

রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে

হয়তো জমিয়া আছে

সূর্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি ;

তবু আজ হৃদয়ের

ভরিয়া নিলাম পাত্র,

এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে

স্মরণ জড়ায়ে রাখে,

মরণ শাসায়।

তবু মুহূর্তের ভুল—

ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু

অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হতে

উল্কা আসে পৃথিবীর

নিষ্করুণ নিঃশ্বাসে জ্বলিতে ;

'ষ্টেপে'র দিগন্তে দেখি

আগু-পিছু তুষারের

মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হতে

আজিকার নীল দিন

জীবনের দিগন্তে ছড়ায় ;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।



কথা

তারপরও কথা থাকে ;
বৃষ্টি হয়ে গেলে পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন.
আবছায়া মেঘ মেঘ কথা ;
কে জানে তা কথা কিংবা
কেঁপে-ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।

সে কথা হবে না বলা তাতে ;
শুধু প্রাণ-ধারণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে
অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।

অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে কথায় ধরে !
তুষারের মতো যায় ঝরে
সব কথা কোন এক উত্তুঙ্গ শিখরে আবেগের।

হাত দিয়ে হাত ছুঁই
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।
সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়,
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়।

তারপর জীবনের ফাটলে ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।



আরো এক

আরো একজন আছে
নাম যার ধরি না কখনো ;
মনে পড়ে যায় শুধু
কাজ সেরে ক্ষেত ও খামারে,
ঘাম মুছে এক হাতে
জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন ;
শুনি তার নিঃশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার,
শিহরায় অরণ্য গহন।

এ-বেড়া হবো না পার ;
ঘরে ফিরে গিয়ে ফের

হেঁসেলের গন্ধ নিয়ে বুকে
আলো জ্বেলে মেলাব হিসেব ;
যার কাছে যত দেওয়া-নেওয়া,
পাণ্ডা ও পুলিশ আর চালের আড়ত,
অতীত ও বর্তমান, দূর ভবিষ্যৎ।

সব বোঝাপড়া শেষে
তবু জানি কি রহিল ফাঁকি,
বিনিদ্র রজনী ধরি
রক্তাক্ত হৃদয় তাই গনিবে একাকী।



বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১৯০৬)

অতঃপর

প্রেমের কবিতা লিখব বলে তো বসেছি।
অথচ এ-আমি এই কিছুদিন আগেও,
সম্বল যার অশ্রু-সজল পাথেয়,
সেই কাব্যকে শ্লেষবন্ধনে কষেছি।

যুগের ধর্ম মানতেই হবে বাঁচলে,
আমারও মনন তাই সে ছোঁয়াচ ধরেছে।
প্রথম প্রণয় যত বিস্ময়ে ভরেছে,
প্রতিক্রিয়ায় তুমি সখি তত ভাসলে!

তোমার ভাগ্য! কবিতাব বিধিলিপি
দুরূহ প্রতীক-ধোঁয়ায় করেছি কানা,
কাব্য হয়েছে শুদ্ধ কঠিন দানা,
তুমি উবে গেছ, রয়েছে শোলার ছিপি!

আজ সন্ধ্যায় বেবাক শূন্য মনে,
কৃষ্ণতিথির নিথর আকাশে চেয়ে
দেখি লাল নেই; শুধু ফিকে নীল ছেয়ে
নামে হেমন্ত নিবিড় কথার বনে।

সেথা কিছু নেই। শুধুই বেদনা-নীল
কুয়াশার ঘোরে জড়িত স্বপ্ন-সারি,
সেই ফাঁকে-ফাঁকে নরম আলোর ঝারি
ছিটিয়েছে সুর, কি আশ্চর্য মিল!

মনে রঙ লাগে। যুগান্তরের পারে
মানুষ আবার সুস্থ স্বাধীন ভাবে
স্বাধিকার-জোরে ভালোবাসা ফিরে পাবে,
হয়তো পৃথিবী হারাবে শূন্যতারে।

এখন কোথায় সত্তা তোমার-আমার?
কি সব ভাবছি— কি যে হল মোর আজ!
পরতে-পরতে খোলে মর্মের ভাঁজ
দুলে-দুলে ওঠে মন-কেমনের ভার।

ওহো! তাই বলি, স্নিগ্ধ সান্ধ্য বেশে
তুমি এলে ঘরে বেঘোর চিন্তা-শেষে!
রোজই দেখি— তবু এমন করে তো দেখিনি
তুমিই তাহলে চমক-হারানো হরিণী!



অজিত দত্ত

(১৯০৭)

যদি তাই হয়

একবার মনে হয়, দূরে— বহু দূরে— শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া ম্লান-দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে
আঁখি হতে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে;
মোদের জানালা পথে বয়ে যাক পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ-শরৎ
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে
সে চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি।



নষ্টচাঁদ

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।
মুখোমুখি বসে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার ?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন ছায়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

মেয়ে মানুষের বেশি মন থাকা উচিত না,
আমাদের মন তাই পারেনিকো সামলে।
রুদ্র-গ্রীষ্মে আকাশে থাকেই তো তৃষ্ণা
সব মিটে যাবে চোখের বর্ষা নামলে।
দুটো পয়সার সাশ্রয় কিসে হবে
সেদিকে বরং পারো যদি চোখ রাখতে,
বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে ও বর্তে রবে
পাকা-বাড়ি করে সেখানে পারবে থাকতে।

শখ-টখ যতো সবই জেনো ছেলেমানষি
কুড়ির পরে কি ও-সব রাখতে আছে ;
জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পানসি
আসল প্রশ্ন প্রাণটা কি ভাবে বাঁচে।
হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়-গিরি মেঘের চূড়ায় গলিত চাঁদের ধারা।

পাশ ফিরে শুই ; চাঁদের ভেল্কি সবই জানা গেছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাতেই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা।
তুমি পাশে থাকো রুপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন—
গৃহিণী-সচিব-শিষ্যা এবং— এবং কি জানি কী যে,
জানি না, জানতে চাইনে, জানলে রোজগার হবে ক্ষীণ,
চাঁদ তো উপোসে মরে না ; কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে।



বিশ্রাম

সহস্র সহস্র জন্ম চলে গেলো। শতাব্দীর পর
এলো মহা-মন্বন্তর, সে তো আজ হল কতো কাল।
কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ, পলাশীর রক্তের অক্ষর
জলের লেখার মতো মুছে গেল। স্মৃতির জঞ্জাল
দূর হোক চিত্ত হতে, অতীতের মিথ্যা ইন্দ্রজাল
ছিন্ন ভিন্ন করে এসো এইখানে বাঁধি পুন ঘর ;
এ-মুহূর্তে ভুলে যাও তুমি আর আমি জাতিস্মর,
চেয়ে ছাখো, সূর্য আনে নবজন্মে নতুন সকাল।

উনবিংশ অক্ষৌহিণী শবদেহ অতিক্রম করি
রক্তাক্ত চরণ এসো মেলে দিই হিমসিক্ত ঘাসে,
লক্ষ বর্ষ পরে যেন, এসো করি কুসুম চয়ন—
আবার নয়নে উষা, জ্যোতিষ্কেশা কন্যা বিভাবরী,
পরিস্নাত হয়ে এসো, অনন্ত পথের এক পাশে
অফুরন্ত জীবনের একখণ্ড করি আহরণ॥



সঞ্জয় ভট্টাচার্য

(১৯০৭)

✓ মনে থাকবে না

মনে থাকবে না !
এই আলো, এ বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ— প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও
বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন— নেই তাও
তখনো হয়তো কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার আমার।
দেখবে পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতোবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার ;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে— হয়তো আমার।

বেনামি

আমাদের সেই নীল উজ্জ্বল বিকেল
নেই আর— জানি জানি,
সেই ক্ষণ সেই মন করে যায় তবু কানাকানি,
মনে পড়ে সে মায়াবী পথ—
হাওয়া-মেশা হাওয়ার জগৎ,
হাওয়ার নেশায় দোলা ঝাউ-নারিকেল।

সে বিকেলে ছিল ভালোবাসা
তুমি জানো আমি জানি ছিল দুটি থরো থরো মন,
'ভালোবাসি'— তবু কেউ বলিনি তখন
ভুলে গেছি পৃথিবীর ভাষা।

ভুলে গেছি সেই ভুলে তুমি নেই নেই আর আমি
সেই পথ, সে-বিকেল আমাদের জীবনে বেনামি।



আমার মৃত্যুকে ভুলে যেয়ো

কতো ছবি ভুলেছে তো তোমার আকাশ
কতো লাল অপরূপ কালো রুপো-রং
তাতে তুমি আলো-নীল হয়েছ বরং
হৃদয়ে শুনিনি দীর্ঘশ্বাস,
ছিল না দুরপনেয়
কোনো স্বপ্ন, কোনো স্মৃতি, কোনো ইতিহাস।

প্রাণের প্রয়াণে
ফুরোয় না সবটুকু প্রাণ,
ফুল ঝরে তবু ফুল ফোটায় বাগান,
দিনের আলোর শেষে নক্ষত্রের রাত্রি তবু থাকে
রাত্রির অনার্ত অবসানে
উষা-প্রত্যুষারা নিত্য ভোরের আবির মুখে মাখে।

আলো দাও, হৃদয়ের খুলে দাও মুখ
তোমার আলোর দান বসন্ত আনুক
অনেক অনেক প্রাণে,
পান করো প্রাণের আসব,
দেবার নেবার আছে যা-কিছু তা সব
দিয়ে নিয়ে জীবনের জেনে যাও মানে।

তোমাকে দিয়েছি আমি আমার যা দেয়
মৃত্যু থাক শুধুই আমার
আমার মৃত্যুকে ভুলে যেও॥



সুনীলচন্দ্র সরকার

(১৯০৭)

পৃথিবী, সূর্যকে

কাছেই তুমি, আবার তুমি
লক্ষ যোজন দূর যে,
তাই আমাকে ঘুরিয়ে দেখ
তোমার মনের সূর্যে।
তাই তো আমার ভুঁই আঙিনার
সকল প্রান্ত ঘিরে
ভাবনাটিকে বইয়ে রাখি
অসুপ্ত সমীরে।

সেই ভাবনা রাতের বেলা
নিজেকে চায় জানতে।
বুঝে সুঝে সকালে যায়
তোমায় সাক্ষী মানতে।
কি চেয়েছি, কি পেয়েচি,
কি করলাম সৃষ্টি,
কোনখানে চাই কঠোরতা,
কোন দিকে বা বৃষ্টি—

হাজার বাঁচা ছড়িয়ে আছে
হাজার চলাবলায়,
আনতে হবে সাজিয়ে মেজে
তোমার চোখের তলায়।
অনেক দিনের চেষ্টা আমার
শেষ এখনো দূর যে,
ভরসা শুধু— দেখছ আমায়
তোমার মনের সূর্যে।



বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮)

চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টিশানে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তাই দেখতে।
গাড়ি চলে গেল।— কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন করে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!

— তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাব
যা এতদিন পাইনি।

রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝরে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।— এখানে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে।— কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিল

তোমার সে উজ্জ্বল অপরূপ মুখ! দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।— আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন করে বলি।



পথের শপথ

ব্যর্থ হয়েছে দিন,
রাত্রি আমার বৃথা,
আসো নাই তুমি আসো নাই।
স্বপ্নেই হলো লীন

স্বপ্নের পরিচিতা ;

বাসা নাই তার বাসা নাই।

বিরতিবিহীন কাল

চল্লিশে দিল তাল—

আশা নাই আর আশা নাই।

ছিলো আশা ছিলো কুটিল আঁখির আখরে,

ছিলো বাসা ছিলো বিকচ বুকের চূড়ায়, সুখের শিখরে ;

মনে হয়েছিল কতবার, যেন চপল চোখের ব্যাকুল রেখায়

অশ্রু-হাসির, ছল ক'রে শুধু তোমারে দেখায় ;

মনে হয়েছিলো ঘনচুম্বন-ফেন-উচ্ছল অধর-আধার

সে শুধু উপায়, শুধু উপচার তোমারে সাধার ;

মনে হয়েছিল তড়িৎ-পরশ লাজুক আঙুলে, উদ্বেল চুলে,

চুলের ঢেউয়ের কোঁকড়া কুলায়ে

তোমারেই যেন আনলো ভুলায়ে

আমার ব্যগ্র মত্ত অধীর হাতের মুঠোয় ;

তোমার আকাশে অদ্ভুত যত চাঁদ ফোটে, তারা নারী হ'য়ে যেন

আমার ঘুমের প্রান্তে লুটোয়—

তনুর ধনুতে কানে-কানে টেনে ছিলা

মুগ্ধ, অবোধ, অমর অতনু

যখন করেছে লীলা।

দিনে-দিনে মোর পূর্ণ হয়েছে

যখনই যে-কে নো বাসনা,

মনে-মনে তারই অনুকম্পনে

শুনেছি তোমার ভাষণা।

আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে
আসো নাই তুমি আসো নাই।

আজকে দেখছি আশা ঝ'রে গেছে, বাসা ভেঙে গেছে,
আছে শুধু আছে ভাষা,

আর আছে ভালোবাসা।
তৃপ্ত হয়েছে শতবর্ষের উপবাসী দেহ, পূর্ণ হয়েছে প্রাণ,
তবু গান, কেন গান ?
যে-ভালোবাসায় বিবশ, বিশ্বে জড়ায়ে ধরেছি বুকে
স্বর্গ-নরকে উজাড়ি' পলকে ক্ষণিক দুঃখে-সুখে,
যে-ভালোবাসার হৃৎস্পন্দনে দুঃসাহসের হাত
ভেঙেছে সকল গতানুগতির বাঁধ—
সে-ভালোবাসার দান
এখনও হয়নি শেষ,
এখনও আমার গান
জেগে আছে অনিমেষ।

আজও যায় ডেকে চুপে-চুপে সে কে
কেঁপে-কেঁপে ওঠে প্রাণ,
পেয়ে কার সাড়া হ'লো নীড়হারা
আজও গান, মোর গান ?

জানি, সে তোমারই অসীম, অপার,
অপরূপ মধুরিমা,
কথা-বোনা পাড়ে আজও চাই যারে
পরাতে রূপের সীমা।

যুবক বয়েসে ভেবেছি, তোমার
কোনো দেহে আছে বাসা,
আজ চল্লিশে এসে দেখি শেষে
সে-বাসা আমারই ভাষা।
ভাষার যে-পথে নিত্য চালায়
ভালোবাসা তার যান,
সেই ভাষাকেই ভালোবাসা আজ
করেছে আত্মদান।
যত চলি পথে তত দেখি দূরে
তোমার বিশাল ছায়া ;—
সত্য কি শুধু পথের শপথ ?
লক্ষ্য কি তবে মায়া ?



কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবো না'— এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে— তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।



বর্ষার দিন

সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।
আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
শোধ ক'রে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।
রিমঝিম ঝরে অঝোরে অন্ধ ধারা,
ঘনবর্ষণে আপাত-আত্মহারা
পৃথিবীতে যেন দিন নেই, রাত নেই ;
স্তম্ভিত কাল মেঘ-মায়ালোকে লীন।

পথের পাথরে উঠছে জলের ধোঁয়া,
উঁচু গাছগুলি মাথা নিচু ক'রে চুপ ;
বস্তুগলিত তরলিত এই দিনে
সেই ভালো হয়, সব যদি যায় খোয়া।
তবু ন-টা বাজে, তবু ছাতা হাতে নিয়ে
ট্র্যামে চ'ড়ে বসি আপিশের অভিসারে,
কেরানিকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র দিয়ে
থেকে-থেকে লাগে সিক্ত কোমল ছোঁয়া।

লুপ্ত, নিভৃত, অমর্ত্য এ-দিনেও
মস্ত শহর ব্যস্তমুখর কাজে,
মানুষ-মুষিক বন্দী যে-পিঞ্জরে
আজো খোলা আছে গো-গ্রাসী তার হাঁ-যে।
তারি অদম্য অনতিক্রম্য টানে
অগণ্য ছাতা পথ ক'রে আছে কালো,

বিত্তশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়,
কর্মঠ মুখে চলেছে মোটরযানে।

আমি সেই ভিড়ে নিঃশেষে মিশে গিয়ে
চলি একাগ্র নিরুপাধি, নামহীন।
হাড় থেকে কেউ নিংড়ে নিয়েছে মজ্জা,
পায়ে-পায়ে বাজে জীর্ণ জুতোর লজ্জা,
ব্যর্থ জীবন মূর্ত করেছে যেন
দু-দিনের দাড়ি, রজকরহিত সজ্জা।
জীবন-ডোবানো বৃষ্টি যখন ঝরে
সময়-হারানো স্বপ্ন-জড়ানো দিনে
শ্রাবণ-তাড়ানো উগ্র-বিজলী-জ্বলা
শত নিশ্বাসে আবিল রুদ্ধ ঘরে
আজ বাঁধা পড়ে আগামী কালের ঋণে।

দিন শেষ হয়; বৃষ্টিশেষের নেশা
নিষ্ক্রিয় মেঘে এখনো থমকি' আছে,
ক্ষণিক হলুদ-সবুজ-সোনায় মেশা
অলীক সন্ধ্যা পুন বর্ষণ যাচে।
আহা, সুন্দর এ-পৃথিবী, এ-জীবন,
বিনামূল্যেই অমূল্যতম দান
পণ্যরাশির জঘন্য অনটন
দেহধারীটারে যত দুঃখই দিক
অতল অগমে মুক্ত আমার প্রাণ।
জীবিকা-যন্ত্র যখনি দিয়েছে ছাড়া
তখনই শ্রাবণ পরালো আমার বুকে

সোনায় শ্যামলে গাঁথা তার মালাগাছি।
কত ভাগ্য যে বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

ক্লান্ত, মুক্ত, বিক্ষত, উৎসুক,
ক্ষুদ্র গৃহের ছুর্গে চলেছি ফিরে,
কখনো আবার পাবো না যে-দিনটিরে
তারই শেষ স্মৃতি এখনো আকাশে আঁকা।
গলিটা বিশ্রী, পিচ্ছিল আঁকাবাঁকা,
অসতর্কেরে বেঁধে কর্কশ ধোঁয়া
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওঠে তর্কের মতো
বাদলা দিনের ভিজে কয়লার ধোঁয়া।
বিষণ্ণতার নিঃসাড়তার নেশা
আমার বুকের নিঃশ্বাস কেড়ে নিয়ে
বিশ্বের ছবি মুছে দেয় মন থেকে।
— ভাঙলো চমক বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে।

মৃছু ভঙ্গিতে আধেক ছুয়ার ধ'রে
দাঁড়িয়ে আছে সে রঙিন শাড়িটি প'রে,
মাথার উপরে আধেক ঘোমটা টানা
আধেক ফেরানো মুখটি আড়াল ক'রে।
সব কেড়ে নিতে পারেনি দিনের ফাঁকি,
তবু আছে রাত, তবু কিছু আছে বাকি,
শূন্য মনের সুপ্তির গহ্বরে
পূর্ণতা এনে আলোর অন্তরাতে
সন্ধ্যাদীপের প্রতীক্ষা জ্বলে যেন
একখানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।

মনে হ'লো তারে চিনি, তবু চিনি না যে,
বুঝি না কী-কথা কেমন ছন্দে বলি,
দরিদ্রতার লক্ষ ছিদ্র ভ'রে
অবাধ, অগাধ, বিশাল শ্রাবণ ঝরে
কদম্ববনে বিকশে অন্ধ গলি।
হৃদয়-রূপক কিছু নেই, কিছু নেই,
নেই বেলফুল, রজনীগন্ধা, জুঁই,
চুপ ক'রে শুধু চেয়ে থাকি তার মুখে,
চোখ দিয়ে শুধু কালো চোখ দুটি ছুঁই।
চিরন্তনীর অলক্ষ্য অভিসার
পার হ'য়ে এসে তুচ্ছের বঞ্চনা
বলে কানে কানে, 'আমার অঙ্গীকার
ভুলবো না আমি, কোনোদিন ভুলবো না।'



কবিমশায়

কবিমশাই, অনেক তো ধান ভানলেন ;
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি করে,
ব্যাপারটা কী ? আপনি— হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে পড়ে ?

ঠিক না ? তা বলুন না সে কেমনতর ?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ;
লোকরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন ?

তা— হলে তো শরীরটাতেই সব মিটে যায়।
কিন্তু, দেখুন, মনও আছে ;
মুশকিলটা এই যে মনের আরজি যত
পেশ করা চাই ওরই কাছে।

যেমন ধরুন, কাউকে দেখামাত্র যদি
ঠিক চিনলেন মনের মানুষ,
কেমন করে পাবেন তাকে ? কোন ফিকিরে
এক জোড়া মন, দামাল, বেহুঁশ,

মিলতে পারে ? না গো মশাই, কবুল করুন,
ছটফটানি সবই খাঁচায় ;
উড়তে হলে একলা যাবেন ; মিলতে হলে—
মিলতে হলে শরীরটা চাই।

কেমন মজা ;— শরীরটাকে নিংড়ে ছিঁড়ে
কিছুতেই কি ইচ্ছা পোরে !
আবার মনের সঙ্গে মনের মোকাবিলায়
শরীর এসে জখম করে।

ভালোবাসা ? তা দেখুন না ভালো আমরা
কত কিছুই বেসে থাকি,
সোনাপিসি, কানা বেড়াল, টেবিলচেয়ার
ইত্যাদি সব টুকিটাকি

যাদের সঙ্গে স্মৃতি জড়ায়। তেমনি বিয়ে,
ঘরকন্না, সঙ্গে খাওয়া, করুণ রঙিন
পিছন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে—
যৌবনের আর মেয়াদ ক-দিন।

শরীর কিংবা স্মৃতি নিয়ে আমরা আছি।
আচ্ছা এখন বলুন দেখি,
এই যত সব খুচরো নিয়ে জীবন কাটে,
তাদের সঙ্গে প্রেমের কী ?

মনে করুন আপনি যখন দেখেছিলেন
একটি মেয়ের হাতের নড়া
ঝলক দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে
তারই নাম তো প্রেমে পড়া ?

তখন যে-সব পাতাল-ঠেলা উথালপাতাল
দিয়েছিলো পাগল করে,
সে-উৎসাহ, সে-অশান্তি, সেই আনন্দ
বলুন তো তা কোথায় ধরে ?

কাকের রূপে অবাক হয়ে তাকান যখন ;
কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়ান কোনো কবির
পুরোনো লাইন মনে পড়ে,

এ-সংসারে সেই প্রেম কি ধরে কোথাও
আপনাদেরই মনে ছাড়া ?
আর সেখানে আয়ু তো তার এক-আধ মিনিট ;
না, কাটে না কারোই ফাঁড়া।

তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন
আপনাদেরই গোপন সে-গান ;
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি,
আমাদের আর কেন শোনান।



বিষ্ণু দে

(১৯০৯)

ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখি না কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।

সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?
...
হাল্‌কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাতসমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে।
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে।
নিঃশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।

পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্‌কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?



এল্‌সিনোরে

এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা
এখানে, এখানে শীতল বন্যা বজ্রে ও বিদ্যুতে
আজ এই, আর কাল হয়তো বা শ্মশানকালীর জ্বালা,
এক ফোঁটা জলকণা নেই, চোখ
এমনি কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা!

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিঃশ্বাস।

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ওদিকে আকাশ মুক্ত অথচ এল্‌সিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধপাপের খুন।
তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস।

দুই তটে এসো বাঁধি বৈশাখী বন্যা
পাগলা হাওয়াকে গড়ে তুলি এসো দৈনন্দিন দ্বৈতে
আমার মরুভূ আমার অকালবৃষ্টি
বাঁধব দুজনে পাহাড়ভাঙানো তটে তটে গড়া ঝর্ণা
পরস্পরের সাধারণ্যেই তোমাকে চাই অনন্যা।

চিন্তা আমার গুহাহিত, উদ্দেশ
রাজায় পায় না, হন্তারকের হাতে
অধরা চিন্তা, এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ।

শোনো ওফেলিয়া দোঁহার আত্মদানে
তোমার শরীরে সারেঙীর গানে গানে
জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর।
মন দাও প্রাণ দাও সারা দেশে অনাচারে জর্জর।

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
কূটচক্রের অন্ধ আঁধারে ভাষা
তোমার উৎসে যদি পাই উচ্ছ্বাস।

ওরা কি সবাই দেখেনি বিরাট ছায়া
বধির কালের অতন্দ্র অধিপতিকে ?
এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এল্‌সিনোরের অলিতে গলিতে শিউরে ওঠেনি সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।

পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংহতি
মেলাও অতনু-রতিকে।

বন্ধু আমার বিশ্ব মিলায় হাতে।
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
আশা হতাশার অগম প্রত্যাশায়।

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বর তনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ ধ্রুতারার গান
আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
তুমি সখী বধূ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

তোমার সত্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে
হঠাৎ মেঘের অকাল ধারায় মেটে না আমার তৃষা
দিশাহীন ঘোরে আমার শপথ এলোমেলো চৌদিকে।

নবীন তোমার দুবাহু আমারই পিয়ালগাছের শাখা

বৃদ্ধ পিতার বৃথাই অন্ধ দাবি
(মাটির কি দাবি কুরুবক মন্দারে ?)
কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবি ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী
চাটুকারে।

তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার
এস তুইজনে মৃত্যুর পূতি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।
এল্‌সিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে।

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্বমুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতিঘন ভাষা।

কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো
ওফেলিয়া তুমি মিথ্যা হিসাব গোনো
এনো না কো চোরাগলি
বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলী।

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধদলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ
এবারে তো হবে ভাঙতে এ বিকিকিনি দীর্ঘ আশার বলে
এই প্রেতলোক জীয়াতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে।

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিম্বা কালের বাগানে আমার ঘুমভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ ॥



অন্ধকারে আর

অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে রেখো তোমার মুখ,
দুচোখে দিয়ে দাও দুঃখসুখ
দুবাহু ঘিরে গড়ো তোমার জয়,
আমার তালে গাঁথো তোমার লয়

অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি,
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ ॥



নদীর উৎস যদি জানা থাকে

তুমি যবে পাশাপাশি, বৃষ্টি থামে, রৌদ্রও প্রসাদ ;
তোমার শরৎ সত্তা স্বচ্ছ লঘু সমৃদ্ধ মধুর।
কখনো বা আশ্বিনের শাদা মেঘ, কখনো ঘনায় রং
সূর্যাস্তে বা সূর্যোদয়ে,

পৃথিবীর মেলডিতে লাগে যেন আকাশের সিমফনিক স্বুর ;
হয়তো বা মুহূর্ত পশলা লাল পথে সবুজে স্নুনীলে
এনে দেয় স্বচ্ছতর স্বাদ।
শ্রাবণে তোমার স্মৃতি, মাঘে থাকো চেতনায় মিলে,
তোমার সত্তার সত্য তোমাতে বা তোমাতে আমাতে
শেষ নয়, সে বরং ব্যাপ্ত হয় শব্দের তরঙ্গ যেন
রেশে রেশে দিনে দিনে বছরে বছরে
জীবনের স্তরে স্তরে রূপান্তরে উত্তীর্ণ নিখিলে।

আমার যে দিনগুলি তুলে তুলে ভরেছ আঁচলে,
জানো সে কি কতো দিন, কতো রঙে বিচিত্র রঙিন ?
আজ তুমি কাছে নেই, আছে শুধু একটি আকাশ
আমার সত্তাকে ঘিরে।
আজ ফিরে ফিরে তাই যেদিকে তাকাই
দেখি সেই দিনগুলি তোমার আমার সেই দীর্ঘ ইতিহাস,
খুলে খুলে দেখি তার রূপান্তর,
এদিকে স্মৃতিতে স্থির, আততিতে প্রতিন্যাস,
অথচ একটি স্রোত, দুঃখে সুখে নব নব পরিণতি,
ছেদহীন, অমাবস্যা পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় সকালে
ঘাটে ঘাটে এদেশে ওদেশে স্থানকালে মেশে
তোমার বিকাশে আর আমার বয়সে,
উভয়ের পরিণতি, রূপান্তর উভয়ত এবং স্বতই
মানুষে মানুষে, সমাজে সংসারে, আমাদের উত্তরপুরুষে
সংলগ্ন সন্তত।
সেই দিনগুলি আনি দূরের আড়ালে ফের কথা বলে বলে
ঘুঘুর কূজনে তীব্র ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধতায় তোমারই আঁচলে।

আজ চৈত্র বৈশাখের তাপে দোলে
হাওয়া কাঁপে রৌদ্রে থরোথরো,
পাহাড়ে প্রান্তরে তাপ পাণ্ডুর আকাশে প্রায় লীন,
দুপুর বাতাসে সদ্য নতুন পাতার চাপে
ঝরো ঝরো পাতা পড়ে
পাতা ওড়ে ঘুরে ঘুরে ছড়ায় ওড়ায় উড়ে উড়ে পাকে পাকে জড়ো
নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গনে কথার মতন,
কোথাও বা আকাঙ্ক্ষায় যৌবনের দিন বউল ঝরায়,
মাটির পরাগ ওড়ে ফলন্ত চৈতালী গানে
উন্মুখ প্রকৃতি গন্ধে গন্ধে ভারাতুর
আম জাম কাঁঠালের বনে।

তোমার ফলন্ত সত্তা স্মৃতি আজ নিবিড় শ্রাবণ কিম্বা ভাস্বর শরৎ
আমার জাগায় স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষার মাটি আর ঘনিষ্ঠ আকাশে,
তোমার জীবন্ত সত্তা দেহেমনে বিস্তৃত আকাশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ
জীবনে জীবনে পূর্ণ
তোমাতে আমাতে এক, দিনরাত, কতো দিন,
সমগ্র বছর এক, গোটা এক আয়ুষ্কাল,
বহু ব্যাপ্ত স্থানে কালে,
জীবনে জীবনে কর্মে রূপান্তরিত তবু এক
উভয়ে ও উভয়ত সম্বন্ধের নদী এক বিচ্ছেদ মিলনে—
নদীর উৎস যদি জানা থাকে জানাই তো থাকে
তাহলে বিস্তার তার দিনে দিনে গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে দেশে দেশে সকালে বিকালে রাত্রিতে দুপুরে
ঋতুতে ঋতুতে বাঁকে বাঁকে জল দিয়ে

ফসল বিলিয়ে ফুল ফল দিয়ে ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের মুখে
মোহানার শেষে সমুদ্রের বুকে আত্মদানে
জানা থাকে যদি জীবনের সেই নৃত্য
কালের নূপুর এক ও বহুর বহুধায় একই ইতিহাস—

আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণেরই সেই নদী
প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কর্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত
পাড়ে পাড়ে ঝিকিমিকি এক ও অনেক।
আমাকে থাকতে দাও তোমার দিনের পাড়ে পাড়ে
মাটি কিম্বা একই সে আকাশ।



আলেখ্য (২)

চামেলি মিলেছে একটি মানুষে,
সান্নিধ্যের প্রসাদে তার নৈরাত্ম্যের নম্র বিষাদ
যেন ধূপে ধূপে ব্যক্তিস্বরূপ কর্মীর মতো কর্মে
প্রাত্যহিকেই নিজেকে পেয়েছে বিলিয়ে বারংবার।

কথা বলে যেন আম-জামে পাতা ঝরে,
যেন-বা পাহাড়ে নদীর বালিতে ঝিরিঝিরি সোনা জ্বলে,.
নীরবতা তার বাগানে শিশির.
গাছে গাছে লাগে বউল।

চাহনিতে তার যাত্রারম্ভ, নতুন ঘাসের পথ,
তুই দিকে চলে ঋজু ও সুঠাম তাল,

মাঝে মাঝে দৃঢ় শাল কখনো-বা পলাশের বঙ্কিমা,
এই ছায়া এই রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

সে যখন পাশে তখন সবাই ভোলে,
চলে যায় আর রেখে যায় শত টুকরা
ছোটো ছোটো দিনরাতের সজাগ সতর্ক শত কাহিনী।
সে যেন মাঘের রৌদ্রে ছড়ানো আকাশ
মধুর মধুর ব্যাপ্ত বর্তমানে,
আমরাই ঘুরি অতীতে অতীতে মেঘের ভবিষ্যতে।



অরুণ মিত্র

(১৯০৯)

উৎসর্গ

ধ্বংসের প্রান্তরে হিরণ্ময় আমার ভাবনা
তোমাকে উৎসর্গ করলাম
তোমাকে স্মরণ করলাম
রোদের জোয়ারে জ্যোৎস্নায় অনবদ্য রঙে
আলোর গন্ধ মাখিয়ে
মৃত্যুকে অতিক্রম করে
অবিরাম গতির শিখরে
দৃষ্টির সমস্ত আকুলতা নিয়ে
তোমার দিকে ঘুরলাম
নিজেকে উৎসারিত ক'রে সামনে উপরে সব দিকে
তোমার জন্য ছড়িয়ে রাখলাম অভ্যর্থনা
জানি তুমি যখন পা দেবে অকালের মাটিতে
তার হৃদয় ভরবে জলের কলকলে
অঙ্কুরের গুঞ্জনে প্রতিবিম্বে ঝলমল
আকাশের আলিঙ্গনে।

আমি চোখ খুলেই আকাশের যে-প্রান্তে
সকালকে খুঁজি

সেখানে ভারি নিঃশ্বাস জমে ওঠে
এক একটা দিন যেন কবর
চাপা পড়ে হাসি ভালোবাসা
সমবেদনার ভাষা হাতড়ে ফেরে দেয়ালে দেয়ালে
খুশির খেয়ালে উজ্জ্বল হবার মুখ
থমকে যায় দরাজ গলার স্রোত
ভাটার টানে বয়
ক্লান্ত বেলা ধুলোয় ধূসর
সকালের অবসর করুণ দৃশ্যে ভেঙে পড়ে।

ঘুমের পর মেয়ের দল আসে
শহরের আনাচে কানাচে
তাদের রাতের প্রদীপের ছায়া
ঘোমটায় ওড়নায় থরথর করে
তারা আসে কুয়াশার মতো
ক্ষতবিক্ষত পথে
হাটবাজারে
অস্পষ্ট বন্দরের পসরার ভিড়ে —
কে শুনবে সম্ভাষণ
আপনার জন কে চিনবে
কে কড়ি গুনবে ভালোবাসার
বুকের মধ্যে মুমূর্ষু কত অহঙ্কার
মেয়েরা আসে তাদের ঘুমভাঙা চোখের
অন্ধকার নিয়ে।

নিঃসঙ্গ চিলের ডাকে পানাপুকুরের মতো কাঁপে

মরা খেত
আলের ধাপে ধাপে ওরা নেমে যায়
দলকে দল
বর্ষার ঢল যেন চকিতে দেখা কীর্তিনাশার পাড়ে
জোড়া জোড়া নিটোল বুক
বোঝার মতো ভারি হয়ে আসে
শিশুদের ক্ষীণ চিৎকার
চলার তালে ওঠে পড়ে
শুধু যেখানটা ইটের পাঁজা পোড়ে শিখা ওড়ে
সেখানে এক আহামরি আভা লাগে।

নিভন্ত চোখ ঘুমে ঢুলে এলে
কালো চুলের বন্যা তুললে কপালের টিপে
রহস্য ঘনালে
স্বপ্নের ঐশ্বর্য উবে যায়
বিশ্রামের জমি এমন ক'রে উথলে ওঠে এমন ক'রে
নিবিড় মেঘে মেঘে তেপান্তরের নিরুদ্দেশ ঝড় লাগে

বিধ্বস্ত তন্দ্রা আর জাগরণ
একাকার হয়ে থাকে
এক অশান্ত নীহারিকা প্রসারিত
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে
বাষ্পের পরিমণ্ডলে পৃথিবীর জন্মের মতো
তোমার মুখ জাগে
তার উদ্দেশে আমাকে সমর্পণ করলাম।



বিমলচন্দ্র ঘোষ

(১৯১০)

কোকিল

পুরনো ফাগুনে পুরনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কাকে,
মনে পড়ে যায় দুপুর বেলায়
যেই ফাঁক পাই কাজের ঠেলায়,
দক্ষিণ থেকে উষ্ণ উদাস বাতাস বয়
আকাশময়।

কবে যে কখন বয়স বেড়েছে
কত সঙ্গীরা সঙ্গ ছেড়েছে
নতুনেরা কত এসেছে
সকালসন্ধ্যা দুই দিগন্ত রঙের প্লাবনে ভেসেছে।

আজো ফাল্গুনে বসন্ত আসে মূর্চ্ছনা কাঁপে পঞ্চমে
নানা অকারণ চিন্তায় মন থমথমে,
সূর্যের পানে চেয়ে থাকে রাঙা পলাশবন
উদাস মন,
ক্লান্ত জীবনে পুরনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কাকে—

মনে পড়ে যায় বড় অবেলায়
নানা ঝঞ্ঝাটে বসন্ত যায়
বনপথে শুনি চিরদিনকার কোকিল ডাকে
কাজের ফাঁকে !!



ঘরোয়া

তোমায় শোনাব প্রেমের কাব্য এমন ভাগ্য করিনি
শোনালে হয়তো শোনাতে ওষ্ঠ বাঁকায়ে,
'কোথায় শিখলে এত ঢঙ এত রঙ্গ ?
বানিয়ে বানিয়ে মন-ভোলানোর যত মিছে কথা লিখলে !
জ্যান্তে দাও না ভাতকাপড়
মলেই করাবে দানসাগর
আহা মরে যাই, শখের আদর !
এসব ছলনা বলো না কোথায় শিখলে ?'

তোমায় শোনাব প্রেমের কাব্য এমন ভাগ্য করিনি,
এ সংসারের বোঝা বহে শুধু মরেছি ;
ফুলের মুকুট মাথায় কখনো পরিনি
এ যাবৎ তাই জ্বালাপোড়া নিয়ে কাব্য রচনা করেছি।
প্রেমের কবিতা শুনে
যত খরশান বাণ আছে তব তূণে
পাছে একে একে বিঁধে দাও বুকে
প্রেমিক না হয়ে স্বামীরূপ তাই ধরেছি।

রসিকতা করে যখনি তোমায় বলেছি প্রেয়সি, প্রিয়ে,
মুখভার করে তখনি বসেছ ধোপার হিসেব নিয়ে।
কুড়ি পেরুতেই হয়ে গেছ পাকাগিন্নি,
উপবাস করে মাঝে মাঝে দাও সত্যনারাণে সিন্নি।



জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১৯১১)

স্বগত

মৃদু হাতে ছুঁই মুঠি ভরে নিই তোমার ও মুখ
সন্ধ্যাকালে।
প্রান্তর ঘেঁষা মনেরে বুঝাই,
রজনীগন্ধা শত যোজনে তো একটি ফোটে
এখন, যখন
আমারই আয়ুর অলিন্দে এসে কিশোর এ চাঁদ
বাঁশের খোঁচায় জরজর এই বাঁশবাগানে,
গৃহ উপান্তে,
এই মুহূর্তে।
উপন্যাসে কি চন্দ্রালোকে,
বায়ুকুঞ্চিত দীঘি হেসেছিল বালখিল্যের অনাহত
হাসি? অবাক মেনেছি এ নির্বেদে!
কুচিকুচি করে ছিঁড়ে-ফেলা প্রেমপত্র এ যে!
প্রেমের এ পথ সুগম তো নয়।
আত্মপ্রসাদ নেই তবু বলি
ভুলে গেছি কবে দেখেছি আকাশ জুড়ে
তোমার বিলোল কটাক্ষ। মোরে হেনেছে
চিন্তা, অনিদ্রা আর তিরস্কৃতি,
তোমার স্মরণ।

মুখে মুখে সব সতীর্থেরা তো ছড়া কেটে গেছে
দেয়ালে এঁকেছে ব্যঙ্গ চিত্র।
লজ্জাই করে।
তবু এ আবির্ভাব।
আগমন নয়। চারুসজ্জার মেখলায় ঘেরা
তোমার চরণ ফুটায় কমল অন্ধকারে।
অদ্ভুত লাগে—চাঁদে-পাওয়া কাক ডেকে যায় বারে-
বারে আকাশের ভদ্র কোণে
কোকিল দুরূহ—
গৌরীশৃঙ্গে তুষার সমাধি পেয়েছে কবে—
বাহাদুরি নয়—দুঃখে জানাই।
বিদূষকও নই। প্রতিদিন আমি অন্ধকারে
অস্তিত্বের পালোয়ানী পেশি সজোরে নাচাই।
মনের উলূকী কর্কশ ডাকে রাত্রি কাঁপায়।
দিনের আলোকে কোনো বন্ধুকে বলি বুক ঠুকে :
প্রেমের ব্যাপারে যৌথ ব্যবসা প্রবঞ্চনারই
সামিল, নতুবা বন্ধুকৃত্যে ত্রুটিতালিকার
বোঝা বেড়ে যায়। দুটি বালিকার
মন নিয়ে তুমি বাঁয়া তব্‌লার বোল ফোটাবে কি
এই আসরে।
বন্ধু ছেড়েছি।
অহরহ কোনো প্রেয়সীরে ডাক দিয়েছি জীবনে
উন্মন ক্ষণে।
এদিকে হঠাৎ দুটি পায়ে লাগে বিষম তাড়া—
খেটে খুটে খাওয়া, নিঃশেষ হওয়া ক্ষয়ে যাওয়া
পেশি নিয়ে কি পোষায়?

তবু এ ধাবন কুর্দন যেন সার্কাসী ঘোড়া।
তবু এ ভাগ্য লাঞ্ছনা পায় আমারই হাতের প্রবল ঘ্যায়ে।
শ্রমসাধ্যের ঘামে ভেজা মনে, এই প্রান্তরে
তোমার স্মরণ রজনীগন্ধা শত যোজনে তো একটি ফোটে।



দিনেশ দাস

(১৯১৫)

সবুজ দ্বীপ

দূরের ওই সবুজ দ্বীপ
যেন ফিকে কাঁচপোকার টিপ
কার মসৃণ ললাটে !
যেন ঝলমলিয়ে ওঠে
রাতের তারার মতো সবুজ অস্থিরতায়,
কী সুন্দর ওই ছোট্ট সবুজ দ্বীপটি !

সাবানের ফেনার মতো ছোটবড় ঢেউগুলি
হাজার হাজার ভঙ্গিমায়
ভেঙে পড়ে ওর নিটোল দেহে,
কী মধুর ওই ফেনার পালক-মোড়া সবুজ দ্বীপটি !

আমি যদি ওই ঢেউয়ের মতোই
চুপেচুপে ভেঙে যেতাম তোমার দেহে
অস্ফুট গুঞ্জনে
সারাদিন—সারারাত—
আর তুমি যদি ওই নির্জন সবুজ দ্বীপ হতে !



বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯১৬)

মরা সাধ

আমার যে ছিল সাধ তোমার মনের
একটুকু আলো নিই ; তোমার বনের
বিরলে খানিক বসি ; শিথিল ক্ষণের
অবসরে দেখে নিই ছায়া ঝিলমিল।

আমার যে ছিল সাধ এক পলকের
অবকাশে বসি ওই এলো অলকের
যবনিকাটির আড়ে ; দিঠি-ঝলকের
কিছু আলো নিয়ে গড়ি আমার নিখিল।

দিলে কোথা সেই আলো, সেই ছায়া, রং
তার চেয়ে কোনোকিছু দিও না বরং
অমরতা দেবে বলে দিলে যে মরণ
যতো সাধ মরা আজ—মৃতের মিছিল।

তোমার মনের তল মননের মাপে
মাপতে গিয়েছি যেই এ-প্রাণের তাপে
আশা মিছে অপলাপ হল কী-যে শাপে
ছলনার মায়া কাঁপে আযোজন নীল।

স্বর্ণিল

স্বর্ণাকে একদিন ঝর্ণার পাশে
বললাম—বল দেখি কে কোথায় হাসে ?
সে বলল—ঝর্ণার জলের আওয়াজ
নিয়ে বুঝি বাড়াবাড়ি করাই রেওয়াজ ?···
তখন পাহাড়ে ছায়া, বিকালের আলো···
সে হঠাৎ বলে ওঠে—'এই বেশ ভালো।
চুপ করে আছ কেন কইছ না কথা ?'
বলি—বুঝবে না তুমি কোনখানে ব্যথা।

ফের একদিন সেই ঝর্ণার পাশে
বললাম—শোনো দেখি কে কোথায় হাসে ?
বলল সে—বুঝেছি গো ; আমাদেরই মন।
—আমাদেরই মন ?
সুখে হেসে উঠলাম আমরা দুজন।

আরো একদিন বলি—চেয়ে ত্থাখো স্বর্ণা
পাহাড়ের বুকে ঐ ঝাঁপ দেয় ঝর্ণা।
পাহাড়ে তখন ছায়া, বিকালের স্বর্ণিল আলো···
একটুও শীত নেই ; ওর গায়ে শাড়ি ঝলসালো।
বলল—'ক্লান্ত যে লাগে আজ বড়ো।'
বললাম—'ঝর্ণার মতো ভেঙে পড়ো ;
প্রেমের পাহাড় নিয়ে আমি আছি পাশে।'
তা শুনে সে হাসে,
কৌতুক মেশা মিছে শাসনের ছলে

সে আমাকে বলে—
ঝর্ণার মতো যদি উচ্ছলা হই
পারবে কি হতে তুমি কঠিন পাষাণ
নামের অনুপ্রাস কর না যতই ?
ওদিকে যে অবেলার আলোর ভাসান
পশ্চিম পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয়
সোনালি রোদের রাঙা নিশেন উড়োয়

ছায়া নেমে আসে খদে, অতল অথৈ !
ভাঙা-চোরা ছায়া সব, জমা হয় পাহাড়ের ঢলে
'নন্দাদেবীর' চুড়ো বহুদূরে সোনা হয়ে জ্বলে···
গুঁড়ো হয় নিমেষ কতই।

স্বর্ণা হেলান দেয় পাহাড়ের গায়
শিথিল সে বাহু দুটি তুষারের নদী
ঘুম যেন দেহে তার ছায়া ফেলে যায়
সে-ছায়ায় একটুও বসা যায় যদি
কী-কোরাসে ধমনীরা গেয়ে ওঠে গান
চলে যায় অবেলার আলোর ভাসান
নগ্নিকা 'ক্যাম্প্‌টি'র তাথৈ, তাথৈ—
···আচমকা জীবনের মুখোমুখি হই।

ঝর্ণার সাথে মিলে যায় যার নাম
ঝর্ণারই মতো ভঙ্গিম যার ঠাম
সে মেয়ে তো ঝর্ণাই, আমি গিরি নই—
যদিও মনের খদ অতল, অথৈ !

মৃণালকান্তি দাস

(১৯১৬)

আমি তখন ভাবি

বৈশাখের রৌদ্র-দীপ্ত রাঙা দিন,
গোলমোর গাছের হলুদ ফুলে
এসেছে মুখর মৌমাছি—
ঝিঁঝিঁ ডাকা উদাস দুপুর।

খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে চাঁপাকুড়ালির গাছ
একখানি নিরালা ছায়া
ছড়িয়ে দিয়ে
সবুজ ঘাস, যেখানে কাটতো আমাদের মধু-সন্ধ্যা
মেঘালু দিন।

অসীমের সকল আয়োজন জীবনের রঙে রসে
তেমনি রয়েছে নিটোল, সুন্দর!
আমি তখন ভাবি :
কোথায় তুমি ?
উদাসীন পৃথিবী
চিরকালের যাত্রা পথে চেয়ে আছে
নির্বিকার, নিশ্চুপ।

সমর সেন

(১৯১৬)

ইতিহাস

তোমাকে বললাম—এসো
তোমার ধূসর জীবন হতে এসো,
তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এসো,
যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে,
যেখানে আসে রাত্রের পাহাড়ে ঘননীল আভাস,
নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
আর তারারা জ্বালে তীক্ষ্ণ, নীল আগুনের শিখা
আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।

তুমি কোনো উত্তর দিলে না, শুধু হাসলে;
সে ক্লান্ত, স্তিমিত হাসিতে
রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষণ্ণতা।



স্মৃতি

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, কত মুহূর্তে,
শ্রান্ত হয়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।



মুক্তি

তারপরে আমি গেলাম অনেক দূরে,
অনেক দূরের সেই দেশে,
যেখানে রাত্রে স্বপ্ন আসে
সবুজ পাতায় ম্লান পাখির মতো ;
আর আমি ভাবলাম—
একটি মানুষকে ভুলতে কতোদিনই আর লাগে,
কতোদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর-একজনের শরীর-সর্বস্ব আলিঙ্গন ;
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম !

এখানে শিগগিরই বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত !

কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরানির ক্লান্তিতে,
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে
মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায় ;
ডাস্টবিনের সামনে
মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে ;
এখানে কি কোনোদিন বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত !
আর কোনোদিন কি মুছে যাবে
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম

—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ ।



শেষ বসন্ত

ফাঁকা মাঠে রোজ দেখি
বিবর্ণ হলুদ ফুলের বন্যা
কিসের কালো আভাস রোদে-পোড়া ঘাসের ডগায়,
আর অলস দুপুরে
হাওয়ার ঝলকে শুনি ঝরাপাতার হাহাকার,

আর দিনের পর দিন
ক্লান্ত দিন ক্লান্ত রাত্রিকে প্রদক্ষিণ করে ;
আজো কি বসন্তের যন্ত্রণা কাঁপে
তোমার সমস্ত শরীরে ?

গাছের সবুজ দিগন্তে ছড়িয়ে
বৃষ্টি নেমে এলো—
আর একদিন নিষ্ঠুর, সুন্দর অন্ধকার নামবে
রাত্রের ট্রেনের মতো রুদ্ধশ্বাস :
তখনো কি তোমার পৃথিবীতে থাকবে
পায়রার পায়ের মতো লাল, অলস স্বপ্ন ?
বলো
তখনো কি কাঁপবে বসন্তের যন্ত্রণা
তোমার সমস্ত শরীরে ?



একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হল :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

হরপ্রসাদ মিত্র

(১৯১৭)

গোধূলিতে

গোধূলিতে আকাশ হল নীল
নিঃসঙ্গ একটা গাছের মাথা
ছাদের সমান উঠেছে।—
পূর্ণিমার সমুদ্রে সুদূর অস্পষ্ট এক দ্বীপ
হঠাৎ মনে পড়ে
কবে দেখেছি তাকে রোগশয্যায়,
কালো পাহাড় থেকে নেমে-আসা
শীর্ণ একটি জলের ধারা।



প্রেম

দেখিলাম বহুদূর পাহাড়ের নিচে
কী নিথর বনছায়া কাঁপে !
ত্বপুর তো যায়···
কে ঘুমায় ?

—মণিমালা রায়।

কে বা জানে এলো কোথা স্মরণীয় ঝড়,
দেহ কার কামনায় কাঁপে থরোথর !

দিন হল রমণীয়, আকাশ কী নীল !
হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে, মনে মনে মিল

দেখিলাম কাঁপে ছায়া পাহাড়ের নিচে।
···
তির্যক নামে রোদ রাজপথে—পিচে ॥



কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১৯১৭)

অর্কেস্ট্রা

বেদনা-বিস্ময়ে আমি চেয়ে দেখি উদাত্ত আঁধার
ভ্রমরের মতো কালো কম্পিত চোখের দীঘি তার।
ও-পাশে অনেক দিন স্বুবর্ণের আত্মসমর্পণে
ছায়া ফেলে পাখা মেলে উড়ে যায় মনের দর্পণে।
আমি ভাবি, শুধু ভাবি : কালো চোখ তার।

২

চাঁদকে তুমি জ্বালিয়েছ
স্বপ্নে আগুন লাগিয়েছ।
অনেক রাতে অনেক দিনে
অনেক খুশির আকর্ষণে
আমায় তুমি ভাবিয়েছ।

৩

এক ফালি চাঁদে কী হবে আজকে বল না
অনেক দেখেছি চিনেছি ও-বাঁকা ছলনা।

একা নিরিবিলি খেয়ালের ছায়াপথে
ঘোরা শেষ করে এসেছি তোমাকে নিতে।
দূরে দেখ ওই নীলার আকাশ, মমতায়
আরো নীল হল।   নেমে এস এই জনতায়।

৪

তনুতে তনু নয়নে নয়ন মনেতে পঞ্চশর
কাজল দিনের মেঘের হাটে হয়েছ জাতিস্মর।
কাটছে বেলা হলুদ আভায় নীলের চন্দ্রাতপ
জীবন বনের ক্লান্ত পাখার তীব্র মানস্তর।

৫

দিন হল নিঃশেষ
রাত হল নিঃঝুম
মন হল উন্মন
প্রেম আর—আর ঘুম।



স্বাক্ষর

অখণ্ড স্তব্ধতা শুধু। ক্ষয়িষ্ণু তারার
নাড়ির স্পন্দন আর ক্ষণে-ক্ষণে স্মরণ পড়ার
জ্বালা এক : ছোটো নাম—
জীবনের অন্য পারে তবুও উদ্দাম
প্রতিধ্বনিটুকু শুনি আশ্বিনের ঘাসে
জ্যোৎস্না শিশিরে মেশে কিসের আশ্বাসে ?

জ্বালা-করা চোখ নিয়ে জেগে-থাকা রাত
চাঁদের সারস ভীত বুঝি হায় পিছনে কিরাত।
দিগন্তে রেলের বাঁশি ঘুম-পাওয়া সুর
তারপর অফুরন্ত সকাল-দুপুর।—
সেই নাম বারবার আসে আর যায়
একদিন বেসেছিল ভালো তাই খাজনা আদায়
বুঝি বারবার,—
এইটুকু বেঁচে থাকা তার।
কতটুকু জানা নাম কতখানি আকাশে উড়েছে
ফাল্গুনী পাখির মতো বুঝি চলে গেছে।
কত রৌদ্র পার হয়, কত জ্যোৎস্না পার হয়—তারপর
সবুজ ফসলে বুঝি রাখলো স্বাক্ষর।



কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

(১৯১৮)

তোমাকে ভুলিনি আমি

এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
দেখা হলো ফের অনেক দিনের শেষে।
তুমি দেখা দিলে সেই অভিনব বেশে।
হৃদয় তোমার এখনো উতলা পাখি।

সুচরিতা মোর! সময় আসিলো নাকি?
অধুনা হৃদয়ে জটিল ভাবনা নানা।
বাহিরে বাগানে ফুটেছে হাসনুহানা।
হৃদয় তোমার আজো কি উতলা পাখি?

এদিকে আকাশে উড়েছে বিমানগুলি।
অবাধে ছিঁড়েছে ছড়ানো কুয়াশাজাল।
নিমেষে বিমান ভেঙেছে মাথার খুলি।
ভয়ে নতমুখ নীরবে তালতমাল।

সুচরিতা মোর! তোমাকে ভুলিনি আমি।
বাহিরে আকাশে প্রলয় গভীর হয়।

আসে দুর্যোগ, তার চেয়ে বেশি দামী
হয়তো তোমার পুরানো প্রণয় নয় !

এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
অবাধে ছিঁড়েছে বিমান কুয়াশাজাল।
ভয়ে নতমুখ নীরবে তমালতাল।
হৃদয় তোমার আজো কি উতলা পাখি ?



অশোকবিজয় রাহা

(১৯১৯)

সমুদ্র-স্বপ্ন

হঠাৎ সমুদ্র থেকে লাফ দিয়ে ওঠে এক চাঁদ,
'কী আশ্চর্য! দেখো দেখো!'
(সুজাতার দু'চোখে বিস্ময়!)
'এমন প্রকাণ্ড চাঁদ দেখেছ কখনো?'
(সুজাতার দু'চোখের তারা
কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!)
'এমন প্রকাণ্ড চাঁদ?—না তো!'
(হঠাৎ চাঁদের দিকে গলুই ফেরাই।)

সত্যিই সেদিন
সমুদ্রে চাঁদের স্বপ্ন, সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে চাঁদ,
চাঁদের চেয়েও বড়ো আরেক বিস্ময়
ছিল তার দুটি চোখে
আমি তা দেখেছি!
সেদিনের রূপালি জ্যোৎস্নায়
ছিপ্‌ছিপ দাঁড় ফেলে-ফেলে
জলের ঝালর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
চ'লে গেছি বহু দূরে—সুজাতা জানেনি কিছু তার!

সুজাতার চোখে ছিল চাঁদ,
আমারো দু'চোখে ছিল আরো এক স্বপ্নজাল-ফাঁদ,
দু'জন দু'খানে বন্দী !
সে-সমুদ্র, সেই চাঁদ কত দূরে চ'লে গেছে আজ !
একবার গলুই ফেরাই,
নিরেট চাঁদের মুখে চাই,
কী ঠাণ্ডা পাথর চাঁদ ! বরফের মতো শাদা মুখ !
এ-চাঁদের মুখে চেয়ে সমুদ্র পাথর হয়ে গেছে !

দাঁড় হাতে চুপ ক'রে থাকি,
(সমুদ্র পাহাড়, চাঁদ স্থির হয়ে আছে
পাথরে খোদাই,
দেহের শিরায় রক্তে ঝিঁঝিঁ ডাকে !)

হঠাৎ একটু দূরে ও-দিকের খাঁড়ির কিনারে
যেখানে সমুদ্র-জলে ডুবে আছে পাহাড়ের লেজ—
কারা হাসে ?
(কারা যেন আসে,)
ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয় কথা,
একটু পরেই
ডানা-মেলা শাদা হাঁস—ছুটে আসে ছোটো সে সাম্পান !

'দেখো দেখো, কী সুন্দর চাঁদ !
এমন প্রকাণ্ড চাঁদ দেখেছ কখনো ?'
তরল রূপালি কণ্ঠে সুর বাজে জলের মতন—
ডানা-মেলা শাদা হাঁস তীরবেগে উড়ে যায় দূরে !

দাঁড় হাতে চুপ করে থাকি
নিরেট চাঁদের মুখোমুখি
ঈশ্বরের মতো বোবা।



একটি সূর্যাস্ত

হঠাৎ চমকে উঠি পাখির চীৎকারে
ও-দিকের পাহাড়ে আগুন!

হঠাৎ কে যেন ডাকে নাম ধরে
ফিরে চাই,—মুহূর্তে অবাক!

শালবনে লাল চেলি এক
দপ করে জ্বলে নিবে যায়!

ভৌতিক সূর্যাস্ত এ কি?

মুহূর্তে আবার
চারদিকে অদ্ভুত নীরব।

স্পষ্ট দেখি চোখের উপরে
পাহাড়ের পথ ধরে
মনের ধূসর মূর্তি দ্রুত হেঁটে গেল
তারপর মিলালো হাওয়ায়।

বাণী রায়

(১৯১৯)

একলা দিনে

হয়তো এমনি দিন কাটিবে কতই
তোমার প্রতীক্ষা-ম্লান বসি বাতায়নে
মিলিবে নিঃশ্বাস মম দক্ষিণার সনে।
তোমারে পাব না শুধু পাশে।

বর্ষা যবে আমার এ জগতের পরে
টেনে দেবে যবনিকা বৃষ্টির অক্ষরে ;
রাত্রি জাগে মোহময় চাঁদের আভায়,
তারায় তারায় যবে স্বপন ঘুমায় ;
সঙ্গীহীন দিবারাত্রি ঝরাবে নয়ন।
তোমারে পাব না তবু পাশে।

অনাগত যত দিন আছে
তাহারা কখনো কেউ পাবে কি তোমায় ?
শরতের আগমনী, বসন্তের হোলি,
হৈম কোজাগরী আর প্রথম বৈশাখ ;
সব দিন ছন্দহীন আসিবে বৃথায়।
তোমারে পাব না কভু পাশে।

মণীন্দ্র রায়

(১৯১৯)

নির্বাসিতের গান

আবার দুচোখে এসো পরিপূর্ণ স্মৃতির ভূগোলে
সীমায় সীমায় বাঁধা হে আমার শরীরী প্রতিমা!
ঝড়ে বাঁকা নারিকেলপল্লবে তোমারই খোপা খোলে,
পদ্মার দুরন্ত বাঁকে প্রাণোদ্ধত গ্রীবার মহিমা।

তোমার ও-মুখ আজ দ্বিতীয়ার চাঁদের পাণ্ডুর
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত—যেন রংমোছা কবেকার
পূর্বপুরুষের ছবি—বিষণ্ণ বিস্মৃত, কত দূর!
পূর্ণিমার ঢেউ ভেঙে এসো স্বচ্ছ দুচোখে আবার।

তুমি কি জানো না মেয়ে যৌবনের উদ্দাম নিঃশ্বাস
কাঁপায় তোমার বুকে তীরলগ্ন নৌকার গলুই!
আঁধারের হীরাকসে রুদ্ধ এক জলজ উচ্ছ্বাস
তোমার শরীর ঘিরে কাঁদে, তুমি বোঝো না কিছুই?

কতো রাতে হাটফেরা দেখেছি মাঠের পথে দূরে
আঁধার গ্রামের কোলে অগ্নিবিন্দু তোমার প্রদীপ
প্রতীক্ষায় স্থির; কতো রাত্রিশেষে সোনার মুকুরে
দেখেছি কপালে আঁকো নবারুণ হিঙ্গুলের টিপ।

তোমার তুলনা নাই, কোমলে কঠোর প্রিয়তমা !
বাংলার মাটির মতো কিছু পলি কিছু বা খোয়াই ;
কোথাও শিশুর মতো পুতুলের খেলা কর জমা ;
আঘাতে জীবন গড়ে, কোথাও বা তুমি সে নেহাই।

তোমাকে দুচোখে চাই। এসো তুমি, হৃদয়ে কাঙাল
কাটে না স্মৃতির স্বপ্নে। খুলে ফেল ও-অবগুণ্ঠন।
থেমে যাক ক্লান্ত সুর, ছিঁড়ে যাক সানাইয়ের তাল,
দুহাতে হৃদয় দাও—দাও জলমাটির বন্ধন॥



প্রস্তাব

প্রেমমুকুলিত কৈশোরে কবে প্রজাপতির
পেছনে ছুটেছি বর্ণমাতাল, ফুল থেকে ফুলে ;
কবে নিজে প্রজাপতির আসনে নবযুবতীর
চোখ ছুটিয়েছি, মন ফুটিয়েছি, গিয়েছি ভুলে।

আবেগ এখন কাঁপায় এ মন—তুরঙ্গ নয়—
ভাঙা ঝড়ঝড়ে ট্যাক্সির মতো, গতির চাপে
অপটু শরীরে বিক্ষোভ যেন! ভীরু প্রণয়
উধাও। নিটোল বিজ্ঞ ও বাঁকা হাসির মাপে
মেপেছি হৃদয়—শাদা জল দিতে যে ভদ্রতায়
গয়লারা দুধ মাপে, ফাউ দেয় ; চুপচাপ দেখি
যে অক্ষমতা বুকে চেপে ; আর যে তুচ্ছতায়

চারআনা দামের একটাকা হারে একশো মেকি
টাকার বেতনে ভদ্রতা ঢাকি ;—সেই আবরণ
কালো পর্দায় ঢেকেছে সদর-অন্দর !   তাই
প্রেমের চাহনি আনে না পাওয়ার যাদুশিহরণ।
ভিড়ের যাত্রী, চোখে-চোখ-রাখা কথাকে ডরাই—
চমকাই—যেন, আয়নায়-ছোঁড়া রৌদ্রঝিলিক
ছিঁড়ে দেয় ভিড়ে চলার গড্ডলিকার দড়ি।

ছত্রভঙ্গ স্বাধীনতা তাই লাগে যে অলীক !
পুরনো দিনের তরল প্রেমকে স্মরণ করি।
চোখে-চোখ রেখে যখন ভাষার স্বপ্নসেতু
জড়াতো হৃদয়-মনকে, যখন কালের মাপে
বাঁধা পড়তো না গতিতুরঙ্গ সে মীনকেতু,
কোথায় সেদিন ?   দলিতদ্রাক্ষা প্রেমের চাপে
কাঁপত যেদিন, জ্বলত যেদিন প্রজাপতির
অন্ধ আবেগে ?   হায়রে, সে দিন গিয়েছি ভুলে !

এলে কি তুমি সে সোনার চাবিটি অমরাবতীর
হাতে নিয়ে ?   নয় অতীত স্বর্গ, দাও তো খুলে
ভবিষ্যতের পাহাড়িয়া পাকদণ্ডী পথে
নতুন বসতি গড়ার সাহস।   তোমার প্রেমে
শিকলতোলা এ হৃদয়ে নামুক হাজার স্রোতে
পথিকের ধারা।   আসে যেন পথ দুয়ারে নেমে।

তোমার মনের চাবিতে খুলবে মনের কপাট।
রুক্ষ বন্ধ্যা মাটিতে যেমন মেঘের জলে
জীবনের সাড়া শ্যামসমারোহে ভরে দেয় মাঠ,
সুস্থ প্রেমের আবেগে তেমনি উঠবে ফলে
কাজের স্বপ্ন। প্রাণযাত্রার অন্নজলে
দলিতদ্রাক্ষা প্রেমে দেখা দেবে ফসলের হাট॥



বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৯২০)

অনুভব

তাহলে সকলি স্তব্ধ ! পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্রের
বিছানায় পাশ ফেরা, বাদুড়ের ডানার চিৎকার,
জানলায় মুখ রেখে ফেরারী হাওয়ার দু'দণ্ডের
স্বপ্ন দেখা, শিউলির শিশিরে বিছানা পাতবার

আয়োজন, সব স্তব্ধ ! এমন কি শ্মশানে শিবার
আর কোনো মুখ নেই ; কোনো শকুনের চোখ নেই !
তবে কার শবাধার সময়ের নিজের ঘরেই
পরিত্যক্ত পড়ে আছে রক্তহীন বিবর্ণ আত্মার
বিলুপ্তির মতো এক শূন্য অনুভবের চাদরে
আপাদ-মস্তক ঢাকা ? তবে কার শব যাত্রায়
সময় হল না এই পরিত্যক্ত প্রাণের প্রান্তরে ?

নাকি হৃদয়েরই মৃত্যু এইখানে ? তোমার আমার
সকলি হয়েছে বলা ? নক্ষত্রের, পাখির, ফুলের
তাই আর কথা নেই, তাই আজ ক্লান্ত কুকুরের

প্রেমিকের মতো আর মন নেই ? ফণীমনসার
বুক তাই শূন্য, তাই ত্রিভুবনে সকলি অসার ?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯২০)

মিছিলের মুখ

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ একটি শানিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত ;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান।
ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।

সভা ভেঙে গেল, ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে
পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই মুখ।
আজও দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাঁড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।

কারো বাঁশির মতো নাক ভালো লাগে
কারো হরিণের মতো চাহনি নেশা ধরায়
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জ্বলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
ফসফরাসের মতো।
আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।

অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কাষিত তরবারির মতো
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।

অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিত ধ্বসিয়ে দিতে
ডাক দিই
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাপার করতে পারে।



বন্ধু

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসি কাঁখে চলেছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়ল মনে, খাসা জীবন সেথা।

সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় কর যদি
পেতেও পার কাতলা মাছ, প্রিয়।
কিম্বা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেব গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নখ, বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুঁড়েয় যাবে ফেলে।

পাষাণ-কায়া, হায়রে, রাজধানী,
মাশুল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে ;
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।
ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন

আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারী—
ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে।

ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও ; লোকলোচন উঁকি মারে —
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি—
লেকের কোলে মরণ যেন ভালো।
বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা ; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসি কাঁখে চলেছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো।



অরুণকুমার সরকার

(১৯২১)

জন্মদিনে

সিন্দুক নেই ; স্বর্ণ আনিনি
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য ।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য ?

দুরাশা আমার সীমাহীন বটে
তবুও কি জানি দৈবে কী ঘটে ।
দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত
এ-হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা—
যার জানালায় দু'বাহু বাড়ায়
নেই সেই জন ঘরে অবশ্য ।

এই তো সেদিন সারা প্রান্তরে
সময়ের সোনা দূরবিস্তৃত ।...
হায়রে, কখন কেটেছে সকাল,
দুপুর ছুঁয়েছে বিকেলের লাল ;
তারার আলোতে ভেসে গেছে স্রোতে
গানের প্রাণের হিজিবিজি খাতা !
আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে

ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ ?
যে-কুসুমগুলি মেখেছিল ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ ?
স্মৃতি থেকে তাই এনেছি দু'মুঠো
গন্ধমদির আমন ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য ?



রিখিয়ায়

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।

ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও,
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্তদুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দু'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে।

সোনালী ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে

তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মহুয়াবনে মাটির পুতুল।

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা, পরিমিত দিন।
এই আলো, ঝলোমলো আহ্লাদী নবীন
অসহ্য অপরিসীম দৈবী অপচয়।

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে আনন্দ ঝরে, মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়—আত্মীয়, স্বজন ॥



প্রার্থনা

যদি মরে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই ;
যে-ফুলের নেই কোনো ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল ;
যে-গন্ধের আয়ু এক দিন
উতরোল রাত্রিতে বিলীন ;
যেই রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব নিয়ে জ্বলে,
আমার সত্তাকে করে ছাই।
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(১৯২১)

মনে পড়ে

একটি মেয়ের চোখ আজকে বারবার মনে পড়ে।
প্রথম প্রাণের কথা হঠাৎ উসখুস সেই চোখে,
টিয়াপাখি-রঙ শাড়ি নেশায় রিমঝিম : বলে লোকে।
এমনি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।

ভোমরা গাঁয়ের পথে স্পষ্ট দেখলুম, মনে পড়ে,
ঝুমকো লতার মতো ঈষৎ চমকায় সেই মেয়ে,—
একটি ধানের শিষে হাসির ঝিকমিক দোল খেয়ে
উতরে এলুম কত মাঠের পথ তার রেশ ধরে

আজকে দিনের শেষপ্রান্তে পৌঁছই এ শহরে।
মরছে পাথর-চাপা তেমনি এক মেয়ে বোবা-চোখে
এদেশে—এদেশ নাকি প্রাণের কঙ্কাল : বলে লোকে
এখানে শূন্য মন, চোখেরও ডাক নেই ঘরে ঘরে।

একটি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।



চলে এলুম, তোমায় ছেড়ে চলে এলুম।
সখী আমার হারানো দিন ভালোবাসার ভীরু আশার,
তবু তোমায় ছেড়ে এলুম ছেড়ে এলুম।

চষা-জমির কানে কানেই ভোরবেলার সোনালী গান
গেয়েছিলুম পেয়েছিলুম তার বুকেই ফিরে আসার
ইশারা : প্রাণ, সবুজ ধান, সোনালী ধান।

তবু কখন ঈশানে মেঘ ঈষৎ চায়—
তবুও তার ধূসর চোখ ঘূর্ণি-ঘুরঘুর হাসার
মাটির বুক ফাটার সুখে প্রাণ বাঁচায়!

কোথায় দূরে মিলিয়ে যায় সখী তোমার তাল-তমাল।
মরাই নেই, ধানও নেই সবুজ ধান ভালোবাসার।
ঈশান আনে জোর তুফান, ঘোর আকাল।

২

সব শেষ?
সবুজ দিন, শ্রান্তিহরা আকাশ নেই নেই—
সব শেষ?
ছাড়াই মাঠ, ছাড়াই হাট ধূসর পায়ে পায়ে
মিলছি ভুখ-মিছিলে গাঁয়ে গাঁয়ে,
কারখানায় অন্ধ, দিকভ্রান্ত, ভয় ভয়,

মনের দিকপ্রান্তে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়,
ভালোবাসার
ভীরু আশার
এই কি শেষ নয়?

কখন এরি মধ্যে সেই আশার হাতছানি—
তোমায় খুঁজি ; এদিক-ওদিক চলছে কানাকানি।
কোথাও তুমি নেই যে তাও জানি।
সেই তোমার সবুজ শাড়ি, কালো কাজল-চোখ
ছিঁড়ল টেনে সংগ্রামের সংঘাতের নখ।
সময় নেই, সময় নেই
কবে জানাই শোক।

তবু জানাই শোক!

হঠাৎ কালো হাওয়ায় তাই কিসের গুঞ্জন
যন্ত্রে যদি মেলাই হাত মেলায় হাত মন,
কিসের গুঞ্জন।
স্তব্ধ মেঘ লক্ষ বুকে হৃদয় দেয় শোধ।
যন্ত্রণায় যুদ্ধ। প্রতিরোধ।

আকাশভরা হাওয়ায় ঝরা-পাতার মর্মর—
কখন এল ঝড়!

৩

শেষ রাত্রে মরুধূসর ঝড় এল।

তারপর হঠাৎ এলোমেলো
হাওয়া, হাওয়ায় বৃষ্টি নামল।
তারপর কখন ভোরের চমক। বৃষ্টি থামল।

৪

জানতুম। তুমি ঘোমটা-টানা ফুল রজনীগন্ধা,
লজ্জা-পাওয়া রাঙিয়ে-ওঠা সন্ধ্যা—
নিতান্ত এক গাঁয়ের মেয়ে।
ধান ভানতে, জল আনতে
অজানতে পথ বেয়ে।

সুখেই ছিলুম, এমন দিনে আকাল এল।
ঘর ছাড়লুম, জীবন কী যে দশায় পেল।
সঙ্গে তুমি। পথ হারালে
পা বাড়ালে
ঝড়ে।
রইল না কেউ ঘরে সুখের ঘরে।

তারপর সেই ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ-জাগা অন্ধকারে আবার দেখি তোমায়:
পাগলা হাওয়ায় চুল উড়ছে
চুল ঘুরছে
জ্বালামুখীর সাপ—
চোখে তোমার প্রলয়-পীত তাপ—
তখন আবার ভাবলুম, একি তুমিই? তুমি সুখী তো নও!

প্রাণের মধ্যে আজও আদিম আগুন কি বও ?
তাই কি ঝড়ের হাজার ফণায় আগুন জ্বলে ?
তারপর সেই আগুন গলে চোখের জলে।
আমার মনের আবাদ ভরে বৃষ্টি ঝরে···সোনাও ফলে

গান ধরলুম আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ফিরব যখন ভাঙা বাসায়—দাওয়ায় মাটি লেপে
চাষ করব, গান ধরব, ধানও দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

তারপর কখন ভোর হয়েছে,
বৃষ্টি নেই, হাওয়ায় আলোর ঘোর রয়েছে।
উঠে বসলুম,
সুখে হাসলুম,
মনে ভাবলুম—এবার তুমি আসবে,
আবার ভালোবাসবে।
আবার আমি ঘর বাঁধব, মন সাধব জীর্ণ দেহে
জীবনকে ফের গড়ে তোলার গভীর স্নেহে।



শুদ্ধসত্ত্ব বসু

(১৯২১)

চোখ

তোমার দুচোখে দেখি অতীতের বসন্ত বাহার,
পশ্চাতের বহুদেশ, নগর ও উপনগরের
লুকানো অনেক কথা, বহু মৃত্যু অনুরাগ ঢের,
ফাল্গুনের তীব্র স্বাদে ভারাক্রান্ত দুচোখ তোমার।
বিকালের রাঙা মেঘ প্রতিভাত হয়েছে কখনো,
কখনো বা জীবনের পরমার্থ আদরে সোহাগে
চোখের প্লাবনে মেতে ডাক দিয়ে গেছে অনুরাগে,
কখনো গলেছে তনু অত্যুত্তাপে কখনো বা মনও।

তোমার দুচোখে যেন জীবনের অগাধ ইশারা—
কর্মক্ষত হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাঁচার প্রলেপ,
আজো চোখে রেখায়িত পৃথিবীর প্রথম স্বপন :
আগুনের নীল শিখা জ্বলে, জন্মে প্রাণবতী তারা—
ছন্দায়িত করে দেয় আমাদের প্রতি পদক্ষেপ,
মনের অলিন্দ ছুঁয়ে আসে বুঝি আশ্চর্য যৌবন!



আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

(১৯২২)

অতর্কিত

এসেই তো ঝড় চলে গেল সব নিয়ে—
টিনের চালা, ঘেরাটোপের দরমাটা
বাঁশের বেড়া লাউমাচা ও
তুলসীগাছের মঞ্চকে।

নিভিয়ে দিল এক নিমেষে প্রথমেই
একটি ফুঁয়ে সলতে-জ্বলা তেল-প্রদীপ
অন্ধকারে নীরব কাঁদা সার হল
খুঁজি এখন জলের কুঁজো কি দিয়ে!

সান্‌কি ভেঙে টুকরো হল কয়েকটাই—
ঘরে আমার জোড়া তো এর একটি নাই
উড়ে গেছে ছিন্ন মাদুর
দেখি না তো চিহ্ন এর ;

কান্না দিয়ে ঢাকি
তোমায় এনে কোথায় রাখি

এসেই তো ঝড় চলে গেল সব নিয়ে।

নরেশ গুহ

(১৯২৪)

ট্রেন

স্বর্গের করিনি আশা।
অলকার অলীক বৈভব
স্বর্ণ পারিজাত আর বাসবের অমৃত আসবে
কোনোকালে ভাবিনি যে একতিল অধিকার হবে।
ত্রিলোকরঞ্জিনী নটী উর্বশী রম্ভার
নির্বিকার মুখচ্ছবি কখনো ভাবিনি।
অসম্ভবে দাবী নেই। এখন গম্ভীর
জীবনের দীর্ঘ ট্রেন উর্ধ্বশ্বাস। ঘুরন্ত চাকায়
শব্দের পাঁজর ভাঙে, চূর্ণ হয় সময়ের বুক :
এর চেয়ে দুঃখ দ্রুত ? রোমাঞ্চিত এর চেয়ে সুখ ?
কখন পেরিয়ে গেছি শেষরাতে-আলো-জ্বলা, ঘুমে অচেতন
দুরাশার সিঁড়িতোলা অজানা স্টেশন।
কখন ছেড়েছে গাড়ি, থেমেছে কোথায়,
ঝুড়ি কি জলের কুঁজো হাতে করে কে উঠল,
কারা নেমে যায়,
করবীর ডালে বসে ডেকে যায় যে পাখিটা
কী যে ওর নাম :
আনমনে ছাড়িয়ে এলাম।

প্রকাণ্ড সূর্যের নিচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ পৃথিবী ভরা পড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ—অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।
মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়
পার হয়ে মধ্যরাতে উদ্দাম নদীর
নির্জন পাড়ির 'পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন :
প্রশ্ন শুধাবে না কেউ—'কোথায় যাবেন ?'
আকাশ দেবে না আলো, স্বর্গ পাঠাবে না
অমরার করুণার সেনা।

দ্রুতদৃষ্টি দেখে নেয় অবসন্ন মহানগরীর
সীমান্তে পোহায় রোদ আকাশের আশ্চর্য শরীর
আলোর সমুদ্রে সেরে স্নান।
অতলান্ত নীল তার চোখে ভরা প্রাণ।

আমার সামান্য রুটি, সামান্যই জল
ট্রেনের সম্বল।
কর্কশ কম্বলে ঘেরা অপ্রসর শয্যাভরা রাত
নিয়ে বসে আছি জেগে ; কবে অকস্মাৎ
ছবির মতন ছোটো কোনো এক ইস্টিশানে
ওঠে যদি সে-ও
যারে ভেবে এতকাল হৃদয়ে তুলেছি কত ঢেউ,
যে এসেছে অতিদূর আপনার ঘর থেকে তার

মাঠের শিশির ভেঙে, ফেলে তার মায়ের সংসার,
ফেলে তার সখীসোনা, ফেলে তার দীঘিভরা জল,
ট্রেনের বাঁশির সুরে উতলা চঞ্চল।
সুন্দর কপালে আঁকা বিন্দু বিন্দু ঘাম,
ভোরের ঘুমের মতো স্নিগ্ধ যার নাম,
যে আছে অপেক্ষা করে সহস্র নিদাঘে ভরা যেন এক
ছায়া সুশীতল :
তারে নিয়ে তবে আমি ভাগ করে খাই
তৃষ্ণার পবিত্র তীর্থে সামান্য পাথেয় এই জল।
কর্কশ কম্বলখানি—মমতা চিত্তের—ছেড়ে দিই তারে,
জীবনের অপরূপ সীমান্ত-ট্রেনের উন্মোচিত জানালার ধারে
তখন পাহাড়তলে বিকেলের ছায়া নামে না হয় নামুক,
অরণ্য নীরব :
সূর্যের উজ্জ্বল চোখ ম্লান মেঘে হয় হোক ফিকে।
অন্ধকার নেয় নিক সব।
চোখে তার চোখ রেখে জীবনের জানালায়
আমি শুধু বসি দণ্ড কয়।
না হয় সে নেমে যাবে পরের স্টেশনে,
যাবেই না হয়।



শান্তিনিকেতনে ছুটি

দূরে এসে ভয়ে থাকি :   সে হয়তো এসে বসে আছে,
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না।   যদি দেয় তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙ্গায় উঠাতে।
পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না পাবে না তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায় ?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
—দেরি হোক, যায়নি সময় ?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউণ্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাশ
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙাভাঙা গলা
কবে সে মন্থর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে ? ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন
অকারণে-দিন গেল। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই ? যদি সে নিজেই এসে থাকে ?



নীরেন্দ্র চক্রবর্তী

(১৯২৪)

উন্মোচন

চিন্তায় কেটেছে দিন, রাত্রি ভয়ে। সমস্ত হৃদয়
নিরুচ্চার প্রার্থনায় ঢেলে
জনাকীর্ণ সকালে কি নির্জন বিকেলে
বলেছি তখন—
তোমাকে হারাতে পারি, এই তীক্ষ্ণ সর্বনাশা ভয়
থেকে তুমি মুক্তি দাও আমাকে ; কোথাও কোনোকালে
যেয়ো না যেয়ো না তুমি। যদি যাও, মন
বাঁচবে না তোমাকে হারালে।

এ-ভয় তোমারো। আর তোমারো শয্যায় তাই ঘুম
নামে না, তোমারো মনে হারাই-হারাই
এই ভয় রাত্রিদিন। তাই
যত দূরে যাও তুমি, তবু শতছলে
আবারো ফিরতে হয়, তাই তীব্র ক্রোধের কুঙ্কুম
মুছে যায় বারবার কান্নার কাজলে।

যে-দুঃখ আমাকে দাও, নিজে তারই যন্ত্রণায় জ্বলো
সারাক্ষণ। দিনে আর রাতে
যত না আঘাত হানো, আমি সেই আঘাতে আঘাতে

হয়েছি বিমুক্তভয়, আর
চিনেছি তোমাকে।...তুমি মৌন ছলোছলো
কালো মেঘ সন্ধ্যার আকাশে,
যে-মেঘ পৃথিবী থেকে ঢের দূরে গিয়েও আবার
অশ্রুর আবেগে ফিরে আসে।



নীলনির্জন

এই তো নেমেছে রাত্রি, এই তো
মনের আকাশে ফুটল
জ্যোৎস্না-ধোয়ানো চিন্তার ফুল,
সে-ফুল কুড়িয়ে আনতে
ঘুমের শিয়রে বাড়িয়ে দুহাত
স্বপ্নেরা জেগে উঠল ;
এই তো নেমেছে রাত্রি মনের
নীলনির্জন প্রান্তে।

এই তো নেমেছে রাত্রি, এ-পথে
এতদূরে যার জন্য
কান্না ঝরিয়ে এলাম ; যখন
সারা দেহমনে ক্লান্তি
থরোথরো-পায়ে নেমে আসে, আর
এ-হৃদয় অবসন্ন—
পথে পথে ঝরে পড়ল চাঁদের
স্তব্ধ নীল প্রশান্তি।

রাম বসু

(১৯২৪)

গ্রহণ

অকস্মাৎ ঘনাল গ্রহণ।
তুমি নেই।
বিদ্যুৎ খুঁজতে ছোটে
কেঁদে কেঁদে হাওয়া দিশেহারা
চুল ছেঁড়ে গাছপালা
চিটে হয়ে ঝরে যায় ধান
বজ্র ডাকে নাম ধরে
সমুদ্র পাগল।

তুমি নেই
হৃৎপিণ্ড উপড়ে তুলে
করপুটে নিয়ে পূর্বমুখী
করেছি তর্পণ :
দাও তাকে ফিরিয়ে আমায়
আমার কান্নাকে দেখি ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মতো নক্ষত্রের দিকে ছুটে যেতে।



জগন্নাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪)

কোনো এক শীতকালে

উঠোনে খড় শুকোয়, চিল ওড়ে,
জলপাই গাছে চড়াই ডাকে,
কুমোরে হাঁড়ি গড়ায়,
আমলকির পাতা ঝরে,
ভাবতে ভয় করে যে, সে নেই
মন কেমন করে,
তবু—
দিন কাটাই।

মাঠে যাই,
কালো গাইকে ঘাস খাওয়াই,
মাষকলাইয়ের খেত বেয়ে শীত নামে,
জলন্ধর বিলে জল শুকোয়,
পানকৌড়ি পাখা নাড়ায়,
ভাবতে ভয় করে যে, সে নেই,
মন কেমন করে,
তবু—
মাঠে যাই।

দাওয়ায় বসি,

কী জানি

পিদিম জ্বালতে গিয়ে কান্না পায়,

হাত কাঁপে,

রাতের দিকে তাকাই—

প্রকাণ্ড অন্ধকার,

মনে হয় পোহাবে না ;

মাছুর পাতি,

অনেক রাতে আবার গুটিয়ে রাখি,

হাওয়ায় বাতি নেভে,

মনে পড়ে যে, সে নেই—

কান্না পায়।



বটকৃষ্ণ দাস

(১৯২৫)

অভিজ্ঞান

এইতো ফুরাল স্বপ্ন ! দীর্ঘছায়া দেওদার বনে
এইতো আঁধার এলো ! জোনাকির মৃদু পাখনায়,
ঘাসের গভীর শিষে, ঝিঁঝিঁদের চোখের তারায়
এইতো নামলো রাত অপরূপ রূপের প্লাবনে !
পশ্চিম আকাশে মেঘ। অলিন্দের, কক্ষের নিভৃতে,
বেলোয়ারী বাতিঝাড়ে, মেহগনি পালঙ্কের গায়,
রঙিন জাপানী ডল্-এ, রামধনু আঁকা জানালায়,
অর্কিডে, চৈনিক শিল্পে, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে

তবু তো গোধূলি এসে অভিজ্ঞান রেখে গেছে তার
মণিময় অঙ্গুরীয়ে। হে হৃদয়, তবে এতোদিন
প্রেমের প্রথম ভাগে যা পড়েছি, সে কি সব ভুল,
কথার আতসবাজী ? এই ক্লান্ত নীল অন্ধকার
প্রাণের সম্রাট হবে ? স্বপ্নের শিয়রে উদাসীন
এ রাত্রি দেবে না খুলে জীবনের স্বর্ণ উপকূল ?



সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

(১৯২৫)

সে

তবু গান পায় আকাশের বিস্তার
মন ভেঙে ফেলে রুদ্ধশ্বাস এ ঘর
রাত ছিঁড়ে দিন কথা কয়, বার বার
ধানে চমকায় বন্ধ্যা এ প্রান্তর।

শীর্ণ দু-বাহু যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে
তুলে নেয় বোঝা রুক্ষ এ পৃথিবীর,
দুমড়ানো দেহ সমুদ্র বুকে নিয়ে
দেখে গাছে গাছে ফাল্গুন অস্থির।

দিন ক্ষয়ে যায় পাথর প্রহরে ঘ'ষে,
তবু কী তীক্ষ্ণ প্রাণের তীব্র আশা,
ঘৃণার কাদায় মাথা তুলে দেখি ফোঁসে
একটি নিবিড় পদ্মের ভালোবাসা।

চোখে জেগে থাকে একটাই মুখ, যার
হৃদয়ের নীলে সূর্য বসে না পাটে,
অথচ প্রতিটি রাত্রির তলোয়ার
যাকে প্রতিদিন নির্মম হাতে কাটে॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯২৬-১৯৪৭)

ব্যর্থতা

আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী
পার হতে সাধ জাগে, মনে হয় তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ,
চাষার ছেলের হাতে এসে যেতো হঠাৎ আজ।
তাহলে না হয় আকাশবিহার হতো সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে-যেতে ছুঁয়ে যেতো কপোল ;
জনারণ্যে কি রাজকন্যার নেইকো ঠাঁই ?
কাস্তেখানাকে বাগিয়ে আজকে ভাবছি তাই।

অসি নাই থাক, হাতে তো আমার কাস্তে আছে,
চাষার ছেলের অসিকে কি ভালোবাসতে আছে ?
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে কাস্তে দৃপ্ত-কিরণ।
হে রাজকন্যা, দৈত্যপুরীতে বন্দী থেকে
নিজেকে মুক্ত করতে আমায় নিয়েছ ডেকে,
হেমন্তে পাকা ফসল সামনে, তবু দিলে ডাক ;
তোমাকে মুক্ত করব, আজকে ধান কাটা থাক।

রাজপুত্রের মতন যদিও নেই কৃপাণ,
তবু মনে আশা, তাই কাস্তেতে দিচ্ছি শান,
হে রাজকুমারী, আমাদের ঘরে আসতে তোমার
মন চাইবে তো ? হবে কষ্টের সমুদ্র পার ?
দৈত্যশালায় পাথরের ঘর, পালঙ্ক-খাট,
আমাদের শুধু পর্ণ-কুটির, ফাঁকা ক্ষেত-মাঠ ;
সোনার শিকল নেই, আমাদের মুক্ত আকাশ,
রাজার ঝিয়ারী ! এখানে নিদ্রাহীন বারো মাস।

এখানে দিন ও রাত্রি পরিশ্রমেই কাটে,
সূর্য এখানে দ্রুত ওঠে, নামে দেরিতে পাটে।
হে রাজকন্যা, চলো যাই, আজ এলাম পাশে,
পক্ষীরাজের অভাবে পা দেবো কোমল ঘাসে।
হে রাজকন্যা সাড়া দাও, কেন মৌন পাষাণ ?
আমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে তুমি তুলবে না ধান ?
হে রাজকন্যা, ঘুম ভাঙল না ? সোনার কাঠি
কোথা থেকে পাবো, আমরা নিঃস্ব, ক্ষেতেই খাটি।
সোনার কাঠির সোনা নেই, আছে ধানের সোনা,
তাতে কি হবে না ? তবে তো বৃথাই অনুশোচনা ॥



প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

(১৯২৭)

পিয়াল

হৃদয়-গহনে ফুটেছিল ছোট চারা—
বেড়ে ওঠে সে-যে অবুঝ, আত্মহারা।
ক্রমে-ক্রমে, আহা, হৃদয়ে যায় না রাখা,
কণ্ঠ জড়ালো চিকন পিয়াল শাখা ;
সে-যে তুমি সে-যে তুমি !

তুমি সে-পিয়াল তোমার এলানো চুল
হাওয়ায় ছড়ানো একমুঠো ঝরা ফুল।
এত ভালো তুমি ছুঁতে ভয় করে, সারা
পৃথিবীর চোখে তবু এ-নিছক ভুল।



বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২৭?)

আশাভঙ্গ

ভালো লেগেছিল। সেই ভালো ছিল মোর,
ভুল করে ভালোবাসলে কেন!
উদাসী হৃদয় নিথর পাথর ছিল,
প্রেমবন্যায় ভাসলে কেন!

আমিই হারব, এই ছিল মোর পণ,
আগে থেকে হার মানলে তুমি,
নিঃশেষে দিতে নিজেরে বিকিয়ে উৎসুক ছিল মন,
ভিখারীর হাত হানলে তুমি!

আশা ছিল এই—তুমি শিব, আব আমি হব পার্বতী
মদন-ভস্মে হবে মোর পরাজয়,
আমার কঠিন তপস্যা সে যে তোমার পাওনা ছিল,
কেন তা হাবালে, সে আশা ভাঙলে কেন!



রাজলক্ষ্মী দেবী

(১৯২৭)

এখনকার কবিতা

হাসির ভিখারী আমি ; নুয়ে-পড়া ক্লান্ত মন নিয়ে
তাই ছুটে ছুটে আসি। কতো কথা বলি যে বানিয়ে,
—কোমল আঁঙুলে ছুঁই—কালো চুলে দুই ঠোঁট গুঁজে
মৃত্যুকে দুহাতে যুঝি। স্নান করি চুমোর সবুজে।
তোমার হাসিতে বাঁচি।
                    কতো যে বেদনা আত্মা জানে—
না-ই বা জানলে তুমি। কান্নার চেয়ো না কোনো মানে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের মতো হাসি চাই। তাই নিয়ে আসা
সাত সমুদ্রের প্রীতি—ঘুম-ভাঙা স্পর্শের কুয়াশা ॥

২

ভালোবাসি ?—হয়তো বা তোমাকেই আমি ভালোবাসি।
তা নইলে এ-কুটিরে, এ-উনুনে আমার কী কাজ ?
সন্দেহ কোরো না তুমি, এ-হৃদয় হবে না সন্ন্যাসী।
—কাল সে বানাবে বসে, ভেঙে যা ছড়িয়ে দিল আজ।

এ সমুদ্রে ঢেউ নেই। জানালায় টুকরো আকাশ
কতোটুকু ! তবু মন এখানেও বাঁচে—কথা বলে।

সামান্যের ধূপে জ্বলে অসামান্য পাওয়ার সুবাস
নিঃশব্দ আমার ঘরে। দোলনায় ছোটো শিশু দোলে।

৩

এই তো বসন্ত, প্রিয়তম। সারা বছরের দেনা
একটি ফুলের অর্ঘ্যে শুধবে সে—কিছু শুধাবে না।
পিছনে চেয়ো না ফিরে। সেখানে মেঘলা দিনে, রোদে,
পূর্ণিমায়, অন্ধকারে—কী দেখাবে ? জীবনের হ্রদে
কতো জল—কী চঞ্চল! অঞ্জলিতে যা ওঠাবে, তার
রূপ নেই, মানে নেই। মানে আছে এই মোহানার।
এ-মিলন—এ-সংগম—এতে আছে সমুদ্রের স্বাদ।
পিছনের কথা তুলে আজকে কি করবে বিবাদ ?

৪

যে-রাত্রিতে তুমি নেই। আর সব আছে।
আছে বই, নির্জন ঘণ্টার সঙ্গী। জানালার ঘষা কাচে
আলোর নিস্তাপ হাসি। ড্রেসিং-টেবিলে আয়নায়
যতোবার চেয়ে দেখি—ক্লান্ত চোখে মেয়েটি তাকায়।
সেলায়ে মূর্ছিত সূচী। খোকাখুকু ঘুমের অতলে।
কালের উদ্বিগ্ন বুকে টিকটিক পেণ্ডুলাম দোলে।

সব আছে। তবু যেন কিছু নেই। ছেয়ে সারা মন
একটি উৎকণ্ঠা শুধু—ঘণ্টি বেজে উঠবে কখন ?



লোকনাথ ভট্টাচার্য

(১৯২৭)

শাশ্বত অরণ্যের জবানবন্দী

যে-কেউ যা-কিছু হোক,
অরূপ বিরূপ হোক,
অপরূপ আপনার অবুঝে
পথ হতে পথ-পার
চলেছে অমৃত-দ্বার
পাতা-ঝরা চেতনার সবুজে।
কত বড় বেদনায়
সবুজ সবুজ হয়,
সে-কথা আমিই শুধু জানি—
তোমায় বলব না,
তোমায় শোনাব না,
শুনতে চেয়ো না তুমি রানী

নাচে পাখি লেজ-ঝোলা,
রাতের তারার মেলা,
চেনা হয় অচেনার সঙ্গে—
কাটে দিন এমনি তরঙ্গে।

কত বড় বেদনায়
অচেনা সে চেনা হয়,
সে-কথা আমিই শুধু জানি—
তোমায় বলব না,
তোমায় শোনাব না,
শুনতে চেয়ো না তুমি রানী!

বহু দূর দূর হতে
অকূল অবাধ স্রোতে
ছোটে নদী মিলন-মরণে—
শ্রদ্ধায় মহিমায়
তীর তার গান গায়
হৃদয়ের কুম্ভ-ভরণে।
কত বড় বেদনায়
সুর ওঠে মোহানায়,
সে-কথা আমিই শুধু জানি—
তোমায় বলব না,
তোমায় শোনাব না,
শুনতে চেয়ো না তুমি রানী!

বুড়ো শীত থুথুরে
কুঁজো হয়ে খুঁজে ফেরে,
সঞ্চয় করে যায় আগামী আগুন—
যদি তার কোনো খেই

আজ কোনোখানে নেই,
অজাত শিশুর তবু ভরে ওঠে তূণ।
কত বড় বেদনায়
জীবন জ্বলতে চায়,
সে-কথা আমিই শুধু জানি—
তোমায় বলব না,
তোমায় শোনাব না,
শুনতে চেয়ো না তুমি রানী!



অরবিন্দ গুহ

(১৯২৮)

স্বর্গের স্বাক্ষর

যদিও শরীর কৃষ্ণাশাড়িতে ঢাকো,
সুদূর দু-চোখে কাজলের রেখা আঁকো,
নগরান্তের ঠিকানার ঘরে থাকো—
তুমি বিচিত্র তৃষ্ণার সরোবর।

সরোবর নও? হয়তো আমার ভুল।
কপালে লুটায় চূর্ণ-চূর্ণ চুল।
উপহার দেবে উপমার শাদা ফুল
তোমাকে আমার বিনীত কণ্ঠস্বর।

আমার কণ্ঠ গেলেও তোমার কানে
মনে যে যাবে না, এ-কথা সবাই জানে;
তবুও অন্ধ অনত বন্য টানে
গানে ভরে ওঠে নির্বোধ নির্ঝর।

আমার রাত্রি অনিদ্র করে দাও;
তাকেই ফেরাও যাকে প্রাণে-প্রাণে চাও,
যাকে ভালোবাসো তাকেই স্রোতে ভাসাও,
যাকে ঘর দেবে আগে ভাঙো তার ঘর।

গ্রীষ্মদুপুরে তৃষ্ণা ছড়িয়ে চলো
আমাকে জ্বালিয়ে তুমি আরো বেশি জ্বলো,
তুমি সরোবর জলে-জলে ছলো-ছলো—
তুমি স্বপ্নের স্বর্গের স্বাক্ষর।



পুষ্প-স্পর্শ

একদিন পাব জেনে মুহূর্তের রুদ্রাক্ষ আঙ্গুলে
ঘূর্ণমান রেখে চলি। হিরণ্ময় বৃক্ষের হিসেবে
আমি মগ্ন; যেহেতু নিশ্চিত জানি প্রার্থনার ফুলে
আজো যা দিলে না তার ঢের বেশি একদিন দেবে।

গভীর স্পর্শের কথা! যে-স্পর্শ পুষ্পের গর্ভে আনে
দেবতার প্রতিনিধি স্থানকালাতীত সর্বদেশে;
তরঙ্গের ঘাটে-ঘাটে প্রকৃতির বাগানে-বাগানে,
এমন কি শ্মশানের শোকলগ্ন নিষ্ঠুর নিমেষে।

আমি সেই স্পর্শ চাই। ঋতু-পরিবর্তনের মুখে
তাকাই। ক্রমশ কমে অতঃপর প্রতীক্ষার আয়ু।
দেখি তুমি অতিমত্ত যৌবনের উজ্জ্বল অসুখে;
তাহলে আসেনি লগ্ন, আজো শূন্য পুষ্পের জরায়ু।

মুহূর্তের আবর্তন অন্তহীন। বৃক্ষের হিসেবে
ভ্রান্তি নেই, মৃত্যু নেই। দেবে, তুমি একদিন দেবে।



দেবদাস পাঠক

(১৯২৮)

একটি সন্ধ্যা

হেমন্তের শেষবেলা পশ্চিমের নগণ্য শহরে ;
শীতের আমেজ রেখে চলে গেল অনাত্মীয় দিন।
বিশীর্ণ পাহাড়ি নদী, লাল বালি, স্তিমিত সূর্যের
করুণ বিদায়স্পর্শ ম্লান হল ঝাউয়ের শাখায়।
শিরশির হাওয়া দিল। সাঁওতাল একটি মিথুন
ঠাণ্ডা জলে পা ভিজিয়ে সোনালি বালিতে ছাপ এঁকে
দূরের গ্রামের দিকে চলে গেল আলপথ বেয়ে।
হালকা কুয়াশা এসে ঢেকে দিল ঘন শালবন ;
ঈথরের ঘন স্তরে মৃদু আন্দোলিত
দূরগামী মানুষের অর্ধস্ফুট স্বর গেল শোনা,
মন্থর ঘণ্টার ধ্বনি গৃহমুখী মহিষপালের।
শব্দহীন, মুহ্যমান দীর্ঘ য়ুক্যালিপ্টাসের সারি
পৃথিবীর কবরের পাশে।

প্রহরখানেক পরে মহুয়াবীথির পরপারে
কুয়াশায় পথ কেটে চাঁদ এল বিষণ্ণ বিধুর।
আর জানো, সুচরিতা, হঠাৎ কি করে সে-সময়

তোমার আবছা মুখ ফিরে এল আঘাতের মতো।
কুয়াশার ভিড় ঠেলে তবু সেই পরিচিত মুখ
সুচরিতা, ক্ষমা কর, মনে আনা গেল না কিছুতে।

অবুঝ দুঃখ আছে, স্মৃতি নেই এতটুকু আর।
এখন অনেক রাত ; হিংস্র শ্বাপদের ডাকে
সচকিত দূরের পাহাড়।



শামসুর রহমান

(১৯২৯)

মনে-মনে

জানি না কি করে কার মমতার মতো
শান্ত-শুভ্র ভোর এসে ঝরে,
জানি না কি করে এত নীল হয় রোজ
ধ্রুপদী আকাশ। ঘাসে এত রং, রোদে
জীবনের সাড়া, বিকেল হাওয়ায় এত নির্জন ভাষা
(জানলো না কেউ) তবু কী করে যে বেঁচে আছে তারা!

ভালোলাগা রঙ নিয়ে
সাধারণ-অপরূপ
কত ছবি আঁকলাম
নগরে ও বন্দরে
হিতকথা বুদ্ধের
শিখলাম, যত নদী
বিকেলের, যত পাখি
সন্ধ্যার—জানলাম।

আমার কি সব তবু ঠিক জানা হল ?
শিশুর চোখের বিস্ময়-আঁকা মায়াবী দৃষ্টি যার

প্রসারিত এই জীবনের গাঢ় মানচিত্রের রঙে,
সুদূর গাঁয়ের কুয়োতলা আর শহরের কোনো পার্কের মৃদু ঘাস,
পৃথিবীর কত রহস্যময় সোনালী রূপালী দ্বীপ,
অনেক মহৎ উজ্জ্বল উপকথা
আবরণ খুলে জীবনের মানে এখনো জানায় যাকে
সে কি তবে তার মুখের উপর বন্ধ দরজা দেখে
ফিরে যাবে একা, ভুলে যাবে গান, বলো ?

হারিয়েছি কত বিকেলের মতো নারী,
বহুবার আমি হারিয়ে ফেলেছি
পাখির দেহের রঙে ঝিলমিল, স্নেহে-ছাওয়া ঘর,
হারাইনি তবু সুরের নূপুর, ভুলিনি আমার গান।

এখনো তো লুট করে আনে মন দিনের প্রবাল,
রাতের হীরের হার,
এখন হাজার সহজ খুশির
নিবিড় ঝর্ণা-আলো,
এতটুকু ভালোলাগা
কুড়িয়ে ছড়িয়ে সহস্র ভিড়ে ডুবে যাই, ভেসে উঠি।
ফুলের মতন তারারা যখন অন্ধকারের স্রোতে
ভাসে, কাঁপে, জ্বলে—মনে পড়ে তার মুখ,
মনে পড়ে তার মুখ।

রাতের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যায়।
যে আছে দাঁড়িয়ে অতি দূর পাড়াগাঁয়ে
দীপ হাতে সেই অভাবের সংসারে

সত্যিমিথ্যে যদি ফিরে যাই হঠাৎ সেখানে তার

বিবর্ণ খেলাঘরে

সে কি আর ভাঙা পুতুল কুড়োবে

কাক-ডানা রাতে একা ?

দুজনের কত গহন দুপুর

চলে গেছে সেই যোজন যোজন দূরে।

যদি ফিরে যাই জামতলা আর পারুলডাঙার মাঠে,

যে যাবে সঙ্গে তার কথা কিছু জানি !



তার শয্যার পাশে

শুয়ে আছে একজন নিরিবিলি ভোরের শয্যায়
শীত-গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন
শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাদরে,
দেয়ালে আলোর পরী। খোলা দরজা। ঘরে ঠাণ্ডা হাওয়া
খেলা করে, ঝর্ণা-হাওয়া ঝরে,

ঝরে একমাথা চুলে, ঝরে

করুণ ক্লান্তির ভারে বুজে-থাকা চোখের উপর।
পাখা নেড়ে, শিস দিয়ে হলদে পাখি উড়ে গেল মেঘে
নির্জন বারান্দা থেকে। সারা ঘরে শান্তি স্তব্ধতার,
কখনো হঠাৎ তার নিমীলিত শুকনো গলা শুনি :
ছায়া-ছায়া-আলো-স্বর—হয়তো ডেকেছে জল দিতে।

শিরশিরে হাওয়ায় কাঁপে শরীরের মেরুন র্যাপার।

চৈতন্যের আলো পড়ে ঘুম-পাওয়া সত্তার পাপড়িতে,
সূর্যের চুমোয় লাল পাণ্ডু গাল। টেবিলের দুটি
তরুণ কমলালেবু চেয়ে আছে দূরের আকাশে,
চিকন সোনালী রুলি ম্রিয়মাণ শঙ্খশাদা হাতে
যেন বেদনায় স্থির—মনে হল—সেই দুটি হাত
মায়াবী নদীর ভেজা সোনালী বালিতে আছে পড়ে।

ফ্লাস্কে দুধ। শিশি। ওডি-কলোনের ঘ্রাণ উন্মীলিত
সারা ঘরে। পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস
কাচের গেলাশে ভরা—গোধূলি-মদির।

কাল সারা রাত ছায়া-অন্ধকারে প্রতি পলে পলে
মোমের শিখার মতো ইচ্ছা তার জ্বলেছিল এই
ভোরকে পাওয়ার। চোখে ছিল
গাঢ় প্রার্থনার ভাষা, বুকে
উজ্জ্বল-আকাঙ্ক্ষা প্রীত জীবনের, সৌন্দর্যের সাধ।
কে যেন তারার মতো কাল রাতে ডেকেছিল তারে
মূক ইশারায় দূরে, তবু সেই একজন জানি
ভোরকেই চেয়েছিল উন্মথিত রক্তের ভিতর,
যেমন সে পেতে চায় প্রেমিকের চুমোর আদর
রাত্রির জঠরলগ্না। ছায়াচ্ছন্ন অপদেবতার
অমর্ত্য চোখের নিচে রাত তার কাটে হরিণের
করোটির ছবি নিয়ে, সারাক্ষণ জেগে থেকে কাল
শুনেছে ধূসর ধ্বনি অবচেতনার অন্ধকারে।

এখন সে শুয়ে আছে ক্লান্তপ্রাণ সম্রাজ্ঞীর মতো
ভোরের আলোয় নেয়ে, ডুবে আছে মসৃণ আরামে।
জেগে উঠে হাত নেড়ে, সোনালী রুলির শব্দ ক'রে
গোধূলি-মদির শান্ত বেদানার রস নিলো চেয়ে,
হাসির আশ্চর্য জ্যোৎস্না তার
ঠোঁট চুয়ে ঝরে গেল (হায়,
অপদেবতার ক্রোধ) ঝরে গেল ভোরের শয্যায়।

অতল হৃদয় বেয়ে উঠলো গান, শান্ত, শব্দহীন,
চোখে তার উপচে-পড়া অপরূপ জয়ের উল্লাস।
ভোরকেই চেয়েছিল উন্মথিত রক্তের ভিতর
সেই একজন।



পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

(১৯৩১)

সহজিয়া

কিছুই কাঁপে না সুখে শোকে-
যেন তথাগত সাড়া নেই—
তোমার চতুর চোরা চোখে,
হাসিও বাউল করে তোলো,
যদিও বয়স সবে ষোলো।

মরমীর দূর দেবালয়ে
যেন ধূপসুরভি তনুর,
একটি স্তবের মতো স্থির
কুন্তল তোমার ত্রিবেণীর—
আকাশেরও প্রদীপ নেবেনি।

এ শুচিও রূপচিত শুধু,
স্বভাবের স্বচ্ছসিত নয়,
যবে এর বাহকী কর্পূর
উবে যাবে, রবে রৌদ্র ধূ-ধূ—
রূপ ক্ষমা করে না সময়।

দূরত্বের নির্লিপ্তি রেখ না—
ঋজুপাঠ হৃদয় শেখেনি—
আমাকে যা দেবে তা এখনি
দাও—অই ষোলোটি শরৎ—
কামনার কবোষ্ণ কপোত।

উজ্জ্বল আবেগে থরথর
তুলে ধর বিকচ অধর ;
অকারণ দ্বিধা যদি আসে
শুনে নিও প্রকৃতি কী বলে :
অধরার পদ্মপ্রতিভা সে।

দূর বাঁধা কাছের শিকলে ॥



শঙ্খ ঘোষ

(১৯৩২)

দিনগুলি রাতগুলি (৮ জানুয়ারি রাত্রি)

আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়, প্রেমের বিষাণে তারা ছুটে ছুটে মাথা কুটে
মরে, ভয়ে কাঁপে দূর দূরান্তর।
কতো বলি, কতো ভালোবেসে মৃদু-স্বরে-সুরে বলি তাকে, রে দুরন্ত
চোখ, স্পর্শ তাকে ক'রো না ক'রো না। সে তবু শোনে না। বারংবার
ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অন্তহীন সে পেয়েছে শুধু একখানি অবসন্ন
দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ। সেই তার ভালো।

কত বলি, শোনো তুমি অবকাশহারা গূঢ় ব্যথায়
আরক্ত-চিত্ত, শোনো। লজ্জার আনীল বিষে মুখ তুমি ঢেকো না
ঢেকো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে
একই বৃত্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু যন্ত্রণার ডালা।
সেই তার ভালো।



আনন্দ বাগচী

(১৯৩৩)

কাকতালীয়

সে তো বলেছিল, আসবই আমি, আসবই, তা সে
যত দেরি হোক : ঝরে যাক মন, সময়, শিশির ;
পৃথিবীর দিনরাত্রির জপমালা জুড়ে স্থির
একটি খবর ব্যাপ্ত : এখানে আসবই। ঘাসে
কেঁপে-কেঁপে বুক রাত্রি নামুক, জোনাকি-তারারা
আলো-চিৎকারে ফেটে নিভে যাক, দুপুর-দুচোখে
রাত্রির জল নীরব রেখায় লিখে যাক সারা
ব্যথার নামতা। নাগকন্যারা নতবুকে টোকে
স্বপনগন্ধা শতবার্ষিকী সন্ধ্যা, ধূসর
ওষ্ঠতটেও বন্যার হাঁক : আমি আসবই
যত দেরি আর যত রাত হোক। সেই চেনা স্বর
গানের কলির নদীর মতোই আজো বুকে বই।

স্নায়ুর নদীতে ঝংকার ওঠে কই সে এলো না ?
কালো রাত্রির কাপড় বোনাও ঝিঁঝিঁদের শেষ
ক্লেশ-মন্থর এ-উদ্‌যাপনা নিরর্থ-লোনা ;
এলো না তবে সে ? আসবে না সেকি ? কানে বাজে রেশ
জ্যোৎস্নার জলে মাঘের শিশিরে প্রশ্ন ছড়ায়

নানা বর্ণের ছড়াকাটা মেঘ বলে, কতকাল
এ-মন এমন উন্মন রবে, চৈত্র-চড়ায়
পাতা-ঝরনার বিপ্রলব্ধা দিন গতকাল।

আমিও মনকে প্রশ্ন করেছি, কথা দিল যদি,
কেন, তবে কেন এলো না ফিরে সে ? শূন্যে শুধাও
হায় মন, তুমি নিজে কি জানো না, কেন নামে যতি
ঝিনুকের ঘুম-মুঠি খুলে কেন স্বপ্ন উধাও।

বারে-বারে আমি বাইরে তাকিয়ে দু-চোখ ফুরিয়ে
ঘরে ফিরে গেছি ; অবাক, অবাক এ কাকতালীয়
বকুল-বিকাল শিউলি-সকাল দিনতলে গিয়ে
গন্ধ রটায় ; ছায়াপট ছোঁয় শ্রান্ত তুলি-ও।
আচমকা কোন কোকিলের ডাকে হায়রে, তাহলে
হৃদয়ের ছায়া-খিলান ছুঁয়েই একটি ঝলক
সরে গেছ আরো গভীরে আমার, ব্যথার বাদলে
তুমি এসেছিলে, তুমি বুঝি তবে হাওয়ার পলক॥



জলসিঁড়ি

ঘুম ভেঙে চোখ রগড়ে তাকাও ভিজে ছবি-ভোর
মেঘলা মলিন জানালার কাচে বৃষ্টিবাউল
আলতো আওয়াজে ছড়া কেটে যায়। পটের উপর
জলতুলি আঁকা নগ্ন করুণ প্রেয়সী-পুতুল।

জল-শাড়ি-পরা এমন স্মুরেলা সকাল বেলায়
কাকে একাঘরে ভালোবাসি, মন ?
মুখোমুখি কার সাথে মাতি বল বিস্তি খেলায়
নানা হৃদয়ের তাশে উন্মন ?
(কাকে ফাঁকাঘরে ভালোবাসি মন ?)

ট্রামছাড়া-ভোর হকার-সকাল আয়নায় কাঁদে
বাইরে এখন বর্ষা-বিশাল বৃষ্টি-রেখা,
হ্রস্বদীর্ঘ চিন্তায় নীল। গাঢ় আহ্লাদে
গত রাত্রির এলো-খোঁপা-মেঘ ঢেলে দেয় ঘুম।

চোরা লণ্ঠন চোখে দিয়ে ট্রাম ছোটে ঠনঠন
সিক্ত সকালে। আবার মেঘের ছাতা-মুড়ি ছাত,
ঘড়ির কাঁটায় ছাই-রঙা-মুখ শহর কখন
হাঁটা শুরু করে, ধর্মতলায় বাড়ায় দু-হাত।



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯৩৩)

তুমি

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে—
তোমার দু চোখে তবু ভীরুতার হিম।
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে—
ছোট এই পৃথিবীরে করেছ অসীম।

বেদনা মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর
অনুভবে মনে হয় এখনো চিনি না,
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর ;
আবার কখনো ভাবি অপার্থিবা কিনা!

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন
দুপুর-দগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা,
তারপর সন্ধ্যার মতো বিস্মরণ—
জীবনকে, স্থির জানি, তুমি দেবে ক্ষমা।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করেছ তাই ঝঙ্কার মুখর।

তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্ফুটে
অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে—
দিয়েছ উত্তর তার নব পত্রপুটে
বুদ্ধের মূর্তির মতো শান্ত দুই চোখে।

